নিরীক্ষা

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী

২১৫ তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২১৫তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

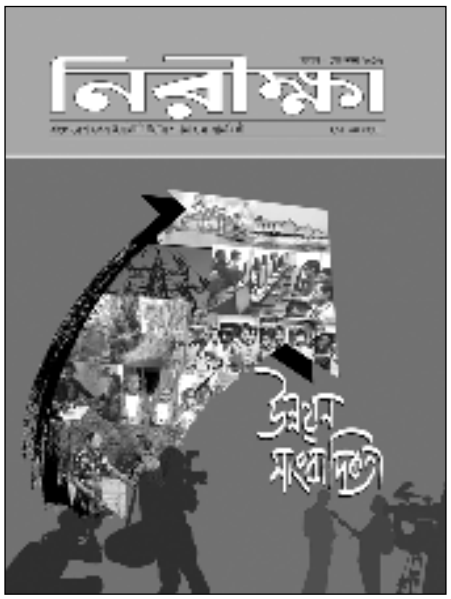

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
সুভাষ চন্দ্র রায়
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৭

উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি বিংশ শতাব্দীতে সাংবাদিকতায় বিশেষ সংযোজন। উন্নয়ন যোগাযোগ প্রেক্ষাপট থেকেই ধারণাটির বিকাশ। যোগাযোগ উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে– উন্নয়ন সাংবাদিকতা তা-ই বলে। পাশ্চাত্যে একাডেমিক মহলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রত্যয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও উন্নয়ন সাংবাদিকতা থেমে থাকেনি। আমাদের দেশেও উন্নয়ন সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কৃষি, জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংবাদের প্রতি জনআগ্রহ রয়েছে বলেই উন্নয়ন সাংবাদিকতা এখানে টিকে আছে। আসলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা শুধু সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার নয়। এর ব্যাপ্তি আরো প্রসারিত। নিরীক্ষা'র বর্তমান সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা, উন্নয়ন যোগাযোগ ও সে আলোকে রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধ দিয়ে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও উন্নয়ন যোগাযোগ একাডেমিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। তাই নিরীক্ষা'র এ সংখ্যাটি সাংবাদিকদের পাশাপাশি গণযোগাযোগের ছাত্র-শিক্ষকদেরও কাজে আসবে বলে আমরা মনে করি। সংখ্যাটি পাঠকের কাজে আসলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সূ|চি|প|ত্র

উন্নয়ন সাংবাদিকতা উদ্ভব বিকাশ ও সীমাবদ্ধতা মিনহাজ উদ্দীন	৫	
সাংবাদিকতা উন্নয়ন সাংবাদিকতা শাইখ সিরাজ	৮	
উন্নয়ন সাংবাদিকতা সময়ের প্রয়োজন শামীমা চৌধুরী	১৪	
বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগ বাস্তবতা: একটি পর্যালোচনা মোহা. মাহামুদুল হক	১৭	
উন্নয়ন যোগাযোগ ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ ড. মাহাবুবুর রহমান	২৮	
উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রাথমিক ধারণা আরশাদ সিদ্দিকী	৩৩	
আমাদের সময়ে মেয়ে ফটোগ্রাফার বলতে শুধু আমিই ছিলাম ..... সাইদা খানম	৩৫	
বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এক অসাধারণ উত্থানের গল্প ড. আতিউর রহমান	৪০	
উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানেই আলু-পটোলের বাম্পার ফলন নয় আমীন আল রশীদ	৪৩	
সম্ভাবনার উন্নয়ন সাংবাদিকতা মো. ইলিয়াছ হোসেন	৪৫	
উন্নয়ন যোগাযোগ ও উপনিবেশ সুফিয়া বেগম	৪৭	
উন্নয়ন যোগাযোগ সৌধ, সৌন্দর্য ও ভিত্তি খান মো. রবিউল আলম	৫১	
টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং শুভ কর্মকার	৫৪	
বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কোন পথে কুদরত-ই-মওলা	৬০	
নারীবিষয়ক গণমাধ্যম ড. শিল্পী ভদ্র	৬৩	
গণমাধ্যম সংবাদ	৬৬	
পিআইবি সংবাদ	৭১	

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৫তম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

বিংশ শতাব্দীতে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি সাংবাদিকতায় বিশেষ এক সংযোজন। ধারণাটির বিকাশ মূলত 'উন্নয়ন যোগাযোগ' প্রেক্ষাপট থেকে। জেনে রাখা ভালো, গত শতাব্দীতে বিশেষ ফল নির্ধারক ঘটনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ *দেখুন- পৃষ্ঠা ৫*

কৃষি ও গ্রাম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বারবারই উপলব্ধি করেছি দেশের সংবাদপত্র তথা টোটাল গণমাধ্যম শহরমুখী তথা রাজধানীকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড দ্বারাই প্রভাবিত; আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা সবই। যেখানে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে এক রকমের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান *দেখুন- পৃষ্ঠা ৮*

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন যোগাযোগ মাধ্যমের প্রয়োজন। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেল বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করছে। রেডিও-টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও, বইপুস্তক, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র, প্রচারপত্র (পোস্টার, ব্যানার), প্রদর্শনী, লোকজ সংগীত, নাটক ও পথনাটকসহ বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে *দেখুন- পৃষ্ঠা ২০*

টেকসই উন্নয়নের ধারণা পরিবেশ সহায়ক ইতিবাচক পরিবর্তন থেকে বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের অন্যতম আলোচনা টেকসই উন্নয়ন। বিশ্বনেতারা টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বদ্ধপরিকর বিশ্বের ১৯৩টি দেশ। বাংলাদেশ এই ১৯৩টি দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত *দেখুন- পৃষ্ঠা ৫৪*

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service @ Doorsteps

গণমাধ্যম সহায়িকা
ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ
প্রেস ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

উন্নয়ন সাংবাদিকতা উদ্ভব বিকাশ ও সীমাবদ্ধতা

মিনহাজ উদ্দীন

'খারাপ কোনো কিছুই ভালো সংবাদ'– এ ধারণা খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেতিবাচক বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। হিউম্যান নেচার বা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রেক্ষাপটেই বিষয়টা অনেকাংশে সত্য। আর সেজন্যই হয়তো পত্রপত্রিকা, সাময়িকী বা সম্প্রচার মাধ্যমে নেতিবাচক সংবাদ বেশি করে স্থান পায়। গ্রামের কোনো এক কৃষক বিশেষ কোনো ফসল ফলিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন, গ্রামের কোনো কিশোরী প্রতিকূল পরিবেশকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে– এমন খবরের বিপরীতে জোড়া খুন, ধর্ষণ, পরকীয়া বা অন্য বিষয়গুলো গণমাধ্যম বেশি করে লুফে নিয়ে পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার সামনে হাজির করে।

নেতিবাচক বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। হিউম্যান নেচার বা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রেক্ষাপটেই বিষয়টা অনেকাংশে সত্য

পাঠক-শ্রোতারাও বিষয়টি গ্রহণ করে সহজাত প্রবৃত্তির আগ্রহ থেকেই।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার উন্নয়ন বা উন্নতি কী? উন্নয়নের বিস্তারিত ও বহুমুখী সংজ্ঞা রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এ সংজ্ঞার তারতম্য হওয়াও বেশ যুক্তিযুক্ত। তবে সহজ কথায় বলা যায়, উন্নয়ন হলো দারিদ্র্যের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ দারিদ্র্যমুক্ত সমাজই উন্নত সমাজ। যে সময় উন্নয়ন সাংবাদিকতার উদ্ভব, সেই সময় (ষাটের দশক) মোটা দাগে দারিদ্র্যপীড়িত সমাজ বেশি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়। উন্নয়ন বলতে সাধারণত বোঝানো হয়েছে এই দেশগুলোর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক অবস্থার উন্নয়নকে।

বিংশ শতাব্দীতে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি সাংবাদিকতায় বিশেষ এক সংযোজন। ধারণাটির বিকাশ মূলত 'উন্নয়ন যোগাযোগ' প্রেক্ষাপট থেকে। জেনে রাখা ভালো, গত শতাব্দীতে বিশেষ ফল নির্ধারক ঘটনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৪)। প্রলয়ংকরী এ মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এশিয়াতেই স্বাধীন হয় বহুদেশ। এরপর জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫, ২৬ জুন) বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতির উন্নয়নে সমন্বিতভাবে নানা কর্মসূচি হাতে নিতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হতো। এক. প্রথম বিশ্বের দেশ বা উন্নত রাষ্ট্র

(উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ধনী রাষ্ট্রসমূহ), দুই. দ্বিতীয় বিশ্বের দেশ বা সমাজতান্ত্রিক বলয়ভুক্ত দেশগুলো (রাশিয়াবলয়ভুক্ত, চীনা প্রভাবযুক্ত ও সমাজতান্ত্রিক দেশ) তিন. তৃতীয় বিশ্বের দেশ (উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলো। মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা)। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উন্নয়নশীল বা উন্নয়নকামী দেশগুলোর ওপর বিশেষ নজর দেয় জাতিসংঘ। ১৯৫৮ সালে সংস্থাটির কার্যকরী অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো'কে এই দেশগুলোর ওপর বিশেষ এক জরিপ করতে দেওয়া হয়। ইউনেস্কো এই দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ জরিপের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী (ব্যাংকক, সান্তিয়াগো, প্যারিসে) তিনটি বড় ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করে। এই তিনটি সম্মেলনের নানা দলিল-দস্তাবেজ, জরিপের ফল, গবেষণা প্রতিবেদন সবকিছু যাচাই-বাছাই করে 'যোগাযোগ' কীভাবে উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে, সেই বিষয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশনা তৈরি হয়। আর সেজন্য ওই সময় জাতিসংঘ শরণাপন্ন হয় বিখ্যাত যোগাযোগ তাত্ত্বিক উইলবার শ্র্যামের। শ্র্যাম ওই সময় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন রিসার্চের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই তাত্ত্বিক পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘসহ নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান 'যোগাযোগ' উন্নয়নের বিশেষ এক মাধ্যম বা উপকরণ হতে পারে। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতে বিশেষভাবে কার্যকর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা সম্ভব। ইউনেস্কো ১৯৬৪ সালে উইলবার শ্র্যামের 'ম্যাস মিডিয়া অ্যান্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট' বইটি প্রকাশ করে। সেই থেকেই বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেতে শুরু করে উন্নয়ন যোগাযোগ ধারণাটি। (কিবরিয়া, ১৯৯১)।

তবে জেনে রাখা ভালো, ওই সময়ই উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটি আসেনি। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরো কয়েকটি বছর। উন্নয়ন সাংবাদিকতা কথাটি প্রথম উৎপত্তি গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষদিকে। এর উৎপত্তি মূলত ফিলিপাইনে। দেশটির সাংবাদিক টার্জি ডিটাচি, ফিলিপাইন প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক জুয়ান মার্কেতো ও সাংবাদিক অ্যালেন চালক্লি এ ধারাটির গোড়াপত্তন করেন। এরপর দেশটিতে 'প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া' গঠিত হলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়টি বিস্তৃত হতে শুরু করে। উন্নত বিশ্ব বা পাশ্চাত্যের সাংবাদিকতার ধারার বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই ছিল উন্নয়ন সাংবাদিকতার লক্ষ্য। ফিলিপাইনের ওই তিন সংবাদকর্মী এ ধারণা বিকাশে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তারা এই বিষয়গুলো গণমাধ্যমে তুলে ধরতে সিদ্ধান্ত নেন। চালু হয় বিশেষায়িত 'ফিচার সার্ভিস'। যার নাম দেওয়া হয় 'ডেপথ্ নিউজ'। যে অংশের সংবাদে প্রাধান্য পায় উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো (কিবরিয়া, ১৯৯১)।

অ্যালেন চালক্লি ও 'প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া': উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটির সাথে প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সংস্থাটির মাধ্যমেই উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটির উৎপত্তি। এ সংস্থার সদস্যদের মাধ্যমেই এক ধরনের বিশেষ সংবাদ 'দ্য ডেপথনিউজ' (উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সংস্থাটি মাত্র তিন বছরে এশিয়ার ২৫০ জন সাংবাদিককে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ১২ সপ্তাহের ওই প্রশিক্ষণে প্রতিবেদকরা উন্নয়ন অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, জনসংখ্যা ও পরিসংখ্যানসহ নানা বিষয়ের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক ও প্রতিবেদনের কলাকৌশল সম্পর্কে তথ্য জানতে পারে।

এদিকে এই কার্যক্রমের মধ্য থেকে উৎপন্ন 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' শব্দটি উদ্ভাবক বলা হয় অ্যালেন চাক্লিকে। এই তাত্ত্বিক ১৯৬৮ সালে ফিলিপাইনে গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেছিলেন। যেখান থেকে মূলত উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটির উদ্ভব। ওই কর্মশালায় চাক্লি উন্নয়ন সাংবাদিকতার সংজ্ঞাও তুলে ধরেন। গবেষক গুনারত্নে চাক্লির অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে উন্নয়ন সাংবাদিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন, যা অধিক গ্রহণযোগ্য। সংজ্ঞাটি অনেকটা এ রকম :

'A Journalist main task was to inform and give readers the facts and the secondary task was to interpret to put the facts in their framework and where possible to draw conclusion. These were the task of all reporters. The development journalist, Chalkley postulated had third task a positive one that may be called `promotion` not only to give facts and their interpretation but also promote them and drive the point to readers.' (Gunaratna 1996) (Page: 29, Book: Development Journalism and introduction by Dinesh C. Sharma, Asian Center for journalism, 2007)

উপরের সংজ্ঞাটিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার একটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। চালক্লির ধারণাপ্রসূত এই সহজ সংজ্ঞার মূল কথা হলো, একজন সাধারণ প্রতিবেদক প্রধানত পাঠককে সংবাদ জানান, প্রয়োজনে অনেক সময় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। একজন উন্নয়ন সাংবাদিক অন্য আরেকটি ইতিবাচক কাজ করে থাকেন। আর তা হলো প্রবর্ধন (Promote) করা। অর্থাৎ কোনো কিছুকে উৎসাহ প্রদান করা। কোনো কাজকে সহযোগিতা করা। চাক্লি এই বিষয়টিই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন, যা উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রধান সংজ্ঞা হিসেবে বিশ্বজুড়ে আজও সমাদৃত।

এদিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় তাত্ত্বিক Fackson Banda বলেছেন : `An intellectual enterprise in which the journalist should form a kind of free intelligence and should critically examine the aims of national development and the applicable instrument in a rational discourse and solve them by reasonable criteria free of social constrains. Accordingly development journalism aims to motivate the audience to actively cooperate in development and to defend the interests of those concerned. And clearly, credibility of journalism of crucial for the success of the project`. (Gidreta, 2011)

Fackson Banda-এর এ সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় একদল বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিক জাতীয় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এই উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন কিছু সংগতিপূর্ণ কিনা, তা মিলিয়ে দেখবেন। একই সাথে একজন উন্নয়ন সাংবাদিক উন্নয়নের পথে বাধাগুলো যথাযথ উপায়ে সমাধা করা হচ্ছে কিনা, তা নিরীক্ষা করবেন। সাথে উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য হবে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। অন্যদিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিক যথাযথ সূত্র ব্যবহার করবেন, যাতে তথ্য বা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো ভ্রান্তি তৈরি না হয়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে আরো একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন Cristine L. Ogan. তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন, "development journalism shows that in some contexts it refers to the communication process that is used to serve the development goals of the government. Usually called development support communication, such journalism uses all forms—mass media, folk media, and small group and interpersonal communication—to promote the total development plans of an authoritarian regime. In other contexts, development journalism has been used in a manner similar to that of investigative reporting. Viewed in this manner, the role of the development journalist is to examine critically the existing development programs and projects of a government, compare the planned project with its actual implementation, and report any observed shortcomings. Any discussion of development journalism is usually emotionally charged. The developing nations claim that the Western journalists are protecting their own capitalistic interests in the world when they attack development journalism as "government say-so journalism." (Cristine L.1980.)

Cristine L. Ogan-এর সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, উন্নয়ন সাংবাদিকতা মূল উন্নয়ন যোগাযোগের একটি অংশ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের উন্নয়ন কাজকে সহযোগিতা করা। সাধারণত কর্তৃত্বপরায়ণ কোনো শাসকের সময় বিভিন্ন পর্যায়ের যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা হয়। অনেকক্ষেত্রে উন্নয়ন সাংবাদিকতা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিতেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কীভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নেয়া হলো, কীভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে, আর এতে কীভাবে কে কে লাভবান হচ্ছে– সে বিষয়গুলো অনুসন্ধান করাও উন্নয়ন সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত। আরেক বিষয় উল্লেখ্য, উন্নয়ন সাংবাদিকতার অনেককিছুই আসলে আবেগ সম্পর্কিত। এখানে আবেগ অর্থাৎ কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক আবেগকে কেন্দ্র করে নানা বিষয় প্রচার বা সম্প্রচার করে থাকে। আর অনেক উন্নয়নশীল দেশ দাবি করে উন্নয়ন সাংবাদিকতার নানা দিক নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়েই উন্নত বিশ্বের সাংবাদিকরা একে 'Government Say-So Journalism' বা 'সরকার যা বলে তা-ই' সাংবাদিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তবে মনে রাখা ভালো কোনো কিছুর যথাযথ সংজ্ঞায়ন খুব একটা সহজ কাজ নয়। আর সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগের কোনো সংজ্ঞার সঙ্গে

বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়। পরিবর্তিত হয় প্রেক্ষাপট। তবে অ্যালেন চাক্‌লিসহ অন্য তাত্ত্বিকদের নানা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সাংবাদিকতার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়, যা মূলত অনেকটা একই রকম। যেগুলো অনেকটা নিম্নরূপ :

উন্নয়ন সাংবাদিকতার লক্ষ্য

১. আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের ধারণা তুলে ধরা।
২. উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত পরিশ্রম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করা।
৩. দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।
৪. সামাজিক, নাগরিক তথা রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি।
৫. সর্বোপরি উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা।
৬. উন্নয়ন কার্যক্রমের অসংগতি, সমস্যা তুলে ধরা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার আওতা

১. গণমানুষ।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
৩. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা।
৪. স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন। (শিশু, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্য)
৫. চিকিৎসা ও ওষুধ।
৬. শিক্ষা ও সাক্ষরতা।
৭. তথ্যপ্রযুক্তি।
৮. আবাসন।
৯. জলবায়ুর পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন।
১০. গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উন্নয়ন।
১১. নারী-পুরুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতা।
১২. অভিবাসন ইত্যাদি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার সীমাবদ্ধতা: এই অংশের আলোচনা শুরুর আগে বলে রাখা ভালো– উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানেই সবকিছু ইতিবাচক নয়। তবে হ্যাঁ এটা হতে হবে উন্নয়ন সম্পর্কিত। অর্থাৎ উন্নয়ন কাজ করতে গিয়ে যদি নেতিবাচকভাবে কোনো বাধা আসে, তাহলে এ বিষয়গুলো উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। এখন আসা যাক, উন্নয়ন সাংবাদিকতার কিছু নেতিবাচক দিকে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যখন উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি বিকশিত হয়, তখন এশিয়ার কিছু কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক এ ধারণাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে, নিজের মতো করে। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে অনেককিছু নিষিদ্ধ করে শুধু উন্নয়নের ফিরিস্তি প্রচারে বাধ্য করে গণমাধ্যমকে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একে ব্যবহার করা হয় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে। আমাদের সবারই জানা, গণমাধ্যম সাধারণ নানা বিষয় নিয়ে 'ক্রিটিক্যাল' বা সমালোচনামুখর হয়। কিন্তু উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি বিকশিত হওয়ার পর একনায়ক কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকরা 'আনক্রিটিক্যাল বা সমালোচনাহীন' গণমাধ্যম কামনা করতে থাকেন। যার মাধ্যমে শুধুই গুণগান শুনতে চান সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানরা। যে কারণেই অনেক সাংবাদিক অর্থের মোহ বা কোনো কিছু হারানোর ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে ফেলেন। আর্থিক সুবিধা পেতে অনেকেই মনগড়া, শাসকের পছন্দের নিবন্ধ লিখতে থাকেন। যাতে বিঘ্নিত হয় উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল চেতনা। আর এ কারণে 'Development Journalism'কে অনেকেই আখ্যায়িত করেন 'Envelopment journalism' হিসেবে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে আরেকটি নেতিবাচক অর্থে আখ্যায়িত করা হয়। তা হলো 'Government Say-So Journalism'. উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটির উৎপত্তির পরপরই এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এ ধারণাটি 'Government Say-So Journalism' নামে পরিচিতি পেতে থাকে। এর মূল কথা হলো– 'সরকার যা বলে তারই প্রকাশ'। এতে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে না। উন্নয়নের নামে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে গণমাধ্যমগুলো শুধু বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ও ঘটনাপ্রবাহে সরকারি বার্তাই প্রকাশ বা প্রচার করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক তাত্ত্বিক একে 'Parrot Journalism' বা 'তোতাপাখি' সাংবাদিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সমালোচনার এই দিকগুলো যে খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা কিন্তু নয়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার নামে অতিরঞ্জিত, তথ্য লুকানো তথা অপসাংবাদিকতা ভারতে বেশি হয় ১৯৭৫-'৭৭ সালের জরুরি অবস্থার সময়। ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এই দুই বছর উন্নয়ন সাংবাদিকতার নামে ভারতে অপসাংবাদিকতা বেশ সহজলভ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ওই সময় সরকারের 'অপপ্রচার তথ্য' (Propaganda Information) প্রচার বা সম্প্রচারে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। যার মাধ্যমে এক কেন্দ্র থেকে সরকারের মনমতো তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ করা হয়, যা প্রচার বা প্রকাশে বাধ্য থাকত গণমাধ্যম। বলাবাহুল্য, এ ধরনের সংবাদে থাকত শুধুই সরকারের গুণগান আর উন্নয়নের ফিরিস্তি। তবে অনেকেই সরকারের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁদের অন্যতম উপমহাদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার। এজন্য বর্ষীয়ান এই সাংবাদিককে ইন্দিরা সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখে ছিলেন তিন মাস।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা বা উন্নয়নের জয়গান গাওয়ার রাষ্ট্রীয় আয়োজন আমরা দেখেছিলাম তৎকালীন পাকিস্তানেও। পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর। লৌহমানব হিসেবে খ্যাত আইয়ুব খান ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। আইয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হওয়ার আগে উন্নয়নের দশক পালন করেছিলেন। যার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। সে সময় শুধু পাকিস্তানের উন্নয়নের জয়গান গাইতে হয়েছে গণমাধ্যমকে। এর কোনো ব্যত্যয় ছিল না। যদিও আইয়ুব খানের ওই শাসনামলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল ভীষণ সীমিত। প্রকৃতপক্ষে চরম বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিল আরো করুণ। কিন্তু তারপরও উন্নয়ন সাংবাদিকতার দোহায় দিয়ে ওই সময় আইয়ুব চক্র এই দেশের গণমাধ্যমে শুধুই উন্নয়নের গুণগান গাইতে বাধ্য করেছে।

শুধু ভারত-পাকিস্তানই নয়। একই অবস্থা ছিল আরেকটি মুসলিম উন্নয়নশীল দেশ ইন্দোনেশিয়ায়। ওই সময় দেশটিতে চলছিল জেনারেল মুহাম্মদ সুহার্তোর (১৯৬৮-১৯৯৮) সেনাশাসন। একইভাবে উন্নয়ন সাংবাদিকতার নামে দেশটির গণমাধ্যম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল সব ধরনের সমালোচনা। ছিল শুধুই উন্নয়নের ফিরিস্তি। এমনকি আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক মাহাথির মোহাম্মদের আমলেও (১৯৮১-২০০৩) উন্নয়ন সাংবাদিকতার আদলে ছিল কড়া সেন্সরশিপ। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো গণমাধ্যমের উপাদান। আর উন্নয়নবিরোধী বা উন্নয়ন নিয়ে নানা অনিয়ম বা তছরুপের ঘটনা ছিল একেবারেই অপ্রকাশিত। বলা যায়, উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটি যেমন এশিয়া মহাদেশে উৎপত্তি আর এই এশিয়াতেই এর অপব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

বর্তমানে এশিয়ায় উন্নতির আইকন চীনও বাদ যায়নি এই অনুশীলন থেকে। মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে বিশেষ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। সেই কর্মসূচির যথাযথ প্রচারে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কয়েক হাজার সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যারা উন্নতির সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি সরকারের দিক থেকে পাঠানো একমুখী তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করেছে বছরের পর বছর। সেসময় চীনের মতো রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল সমাজে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এখনো যে কর্তৃত্বপরায়ণ চীন, রাশিয়া, কিউবাসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল বেশকিছু দেশে এই ধারা অব্যাহত আছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তথ্যসূত্র

কিবরিয়া, গোলাম। (১৯৯১)। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত সাংবাদিকতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ফয়েজ, সিকান্দার। (ফেব্রুয়ারি, ২০০১)। সংবাদ: লেখা ও সম্পাদনা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রাজী, আর. ইসলাম, মঞ্জুরুল এবং ইসলাম, নাঈমুল। (মে ১৯৯৭)। সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ। ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন।

Sharma C. Dinesh, 2007, Development Journalism An Introduction, Manila: The Ateneo de Manila University.

Ahuja, B.N., (2005), A Concise Course in Reporting for Newspaper, Magazine, Radio & TV, Delhi: Surjeet Publications.

Gidreta, Abdulaziz Dino, 2011, Development Journalism: Acceptability and implementation. Leipzig: VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co. KG.

Ogan, Cristine L. 1980. Development journalism/ Communication: The status of concepts. Boston: To the education resources information centers. (ERIC)

লেখক : প্রভাষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

সাংবাদিকতা উন্নয়ন সাংবাদিকতা

শাইখ সিরাজ

কৃষি ও গ্রাম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বারবারই উপলব্ধি করেছি দেশের সংবাদপত্র তথা টোটাল গণমাধ্যম শহরমুখী তথা রাজধানীকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড দ্বারাই প্রভাবিত; আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা সবই। যেখানে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে এক রকমের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যে প্রতিযোগিতার সঙ্গে প্রান্তিক গণমানুষের কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এখানে যে উন্নয়ন সাংবাদিকতা, তা শহরকেন্দ্রিক কার্যক্রমের খবরাখবরের মধ্যেই সীমিত। আমরা বিকশিত গণমাধ্যমের যুগে আছি। গণমাধ্যম দারুণ সাফল্যের সঙ্গেই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর দৌড়ে এখন দারুণ অগ্রগামী। জাতীয় যে কোনো

গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কিংবা দেশের একজন নাগরিক বা গণমাধ্যমের দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে যে তথ্যসেবাটি পাই, তার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ও সময়ের কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হয়

দুর্যোগে, তা সে প্রাকৃতিক হোক আর মনুষ্য সৃষ্ট হোক, গণমাধ্যম যেভাবে ছুটে গিয়ে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেয় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কিংবা দেশের একজন নাগরিক বা গণমাধ্যমের দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে যে তথ্যসেবাটি পাই, তার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ও সময়ের কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হয়। গণমাধ্যমের এই তৎপরতার অনেক ইতিবাচক দিক আছে। যে কোনো দুর্যোগের ভয়াবহতার আতঙ্ক দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কম থাকে। সংবাদ মাধ্যম যদি সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারে, এর মাধ্যমেই অনেক উত্তেজনা নিরসন হয়ে যায়। মানুষের অনিশ্চয়তা ও চিন্তাভাবনার অস্পষ্টতা কেটে যায়। গণমাধ্যমের তাৎক্ষণিক তৎপরতার কারণে ইতিবাচক অনেক প্রভাবই আছে, যা থেকে দেশ মুক্ত হয়েছে নিশ্চিত নৈরাজ্য থেকে। আবার গণমাধ্যমের অনেক নেতিবাচক ভূমিকার দৃষ্টান্তও আছে। ওয়ান ইলেভেনের প্রেক্ষাপটের কথাই ধরা যাক। একটি বিশেষ টেলিভিশন চ্যানেলের দায়িত্বহীন ভূমিকার কারণে পরিস্থিতি উসকে উঠে। যার কারণে জাতি ক্ষতির শিকার হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ। যার খেসারত নানাভাবেই দেশের মানুষকে দিতে হয়েছে। আবার স্মরণকালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের প্রসঙ্গ যদি ধরা হয়, সেখানে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক ও তাজা খবর যেমন পেয়েছে, একইভাবে প্রথমেই ভয় জাগানো অনেক বাড়াবাড়ি রকমের তথ্য দেশবাসীকে

বেসামাল এক শঙ্কার মধ্যেও ফেলেছে। অবশ্য পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা এবং দুর্গত জায়গাগুলো চিহ্নিত করে তাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বোধকরি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও তথ্যের প্রথম জোগানদাতা ছিল মিডিয়া। তাৎক্ষণিক প্রশ্নে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর দিনের তথ্য হিসেবে মুদ্রণ মাধ্যমের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং সঠিক খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে তৎপরতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন দেশবাসীর জন্য অনেক বড় রকমের প্রাপ্তি। কিন্তু লক্ষ রাখার বিষয় হচ্ছে, এই প্রাপ্তি যেন কোনো ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত না হয়ে পড়ে। বড় বড় ঘটনায় মিডিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এটিই স্বাভাবিক। আর সবার এই তৎপর উপস্থিতি এবং তথ্য উপস্থাপনের ভেতর সংগত কারণেই একটি প্রতিযোগিতা কাজ করে। তথ্য সরবরাহের যে প্রতিযোগিতা, তাতে অনেক সময় দর্শক বা পাঠক বিভ্রান্তির শিকার হন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তিও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। বিষয়গুলো অবতারণার লক্ষ্য হচ্ছে সাংবাদিকতা ও তথ্য সরবরাহের কিছু দিক নিয়ে কথা বলতে চাই। অনালোকিত একটি দিক তুলে ধরতে চাই। সেটি হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশেও 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' বিষয়টি একটি মুখরোচক শব্দে পরিণত হয়েছে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক গুটি চালাচালির ভেতর দিয়ে খবর সংগ্রহ করা এবং তা মানুষকে 'খাওয়ানো'র অনুশীলনেই বেশি অভ্যস্ত এখন। অথচ সাংবাদিকতার উৎপত্তি তৃণমূল থেকে। যতদূর জানি, সামন্ত যুগে গণমানুষের মধ্যে রাজ্যের রাজস্বের আয়-ব্যয়ের খোঁজখবর জানানোর জন্য ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার যে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তা একসময় হস্তলিখিত সংবাদপত্রে রূপ লাভ করে। সেখানে দিন দিন যুক্ত হতে থাকে জনমানুষের সুখ-দুঃখের খবরাখবর। সভ্যতার বিকাশে সংবাদপত্রও বিকশিত হয়েছে। যে সংবাদপত্র একসময় কোনো মহৎপ্রাণ মানুষের সমাজচিন্তা প্রকাশের তাড়না থেকে প্রকাশিত হয়েছে, দিনের পর দিন লোকসান দিয়ে মানুষকে জানান দেওয়ার এক অভিযান হিসেবে চালু থেকেছে, সেই সংবাদপত্র কালের বিবর্তনে অন্যতম এক বাণিজ্যিক প্রয়াস হিসেবেও দাঁড়িয়েছে বলা যায়। একসময় পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা সাধারণের কাছে বাউণ্ডুলে পেশা হিসেবে গণ্য হতো, সাংবাদিক মানেই একটু ভিন্ন জগতের মানুষ। দিন-রাত এক করে সংবাদের নেশায় ছুটে চলা এক পেশার প্রতীক ছিল সাংবাদিকতা। সাংবাদিক কখনও সংসারই গুছিয়ে উঠতে পারেননি, অর্থবিত্তের মালিক হওয়া তো দূরের কথা। আজ দিন বদলেছে, সাংবাদিকতা পেশায় থেকে অনেক মানুষই সুন্দর করে নিজের জীবন গুছিয়ে নিতে পারছেন। এর একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও কাঠামোও দাঁড়িয়েছে। যার মধ্য দিয়েই সাংবাদিকতা অনেক ক্ষেত্রে লোভনীয় একটি পেশায়ও পরিণত হয়েছে। এই পেশায় যুক্ত হওয়ার জন্য এখন অনেক বেশি যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নানামুখী শিক্ষাই তার প্রয়োজন হয়। অন্তত রাজনীতি, সমাজকাঠামো থেকে শুরু করে মানুষের অবেগ ও প্রত্যাশা নিয়ে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু তারপরও বারবারই মনে হয়, আমাদের সাংবাদিকতা কাঠামোর ভেতর দেশের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং প্রকৃত উন্নয়ন চিন্তার সত্যিই অভাব রয়েছে। কারণ সংবাদকে পণ্য মেনে মানুষকে খাওয়ানোই শেষ কথা নয়, একটি সংবাদ কীভাবে পরিবারকে, সমাজকে বা জনপদকে আলোকিত করতে পারে, সে চিন্তাভাবনার ঘাটতি দেখতে পাই অহরহ। আমি কৃষি নিয়ে কাজ করি। সাংবাদিকতা করি। আমার সাংবাদিকতার ধরনটি গ্রামনির্ভর, কৃষিনির্ভর। প্রতি সপ্তাহেই কাকডাকা ভোরে গ্রামে যাই। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। অনুষ্ঠানের কাজ করি, ইউনিয়ন পরিষদে বসে স্থানীয়দের সঙ্গে গল্প করি, প্রত্যন্ত গ্রামের সরু খাল পার হই, কোনো এক প্রান্তিক মাঝির সঙ্গে কথা বলি। যে জেলায় যাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জেলার স্থানীয় কোনো সাংবাদিককে সঙ্গে রাখি। জেনে অবাক হই, আমি প্রত্যন্ত গ্রামের যে চিত্রটি দেখছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই সাংবাদিকেরও প্রথম দেখা চিত্র সেটি। আমি যখন সেই চিত্র নিয়ে একটি সংবাদ তৈরির কথা ভাবলাম, তখন সেই সাংবাদিকের কাছে তা অনেকটাই অবাক লাগছে। বছর দুয়েক আগের কথা, যশোরের অভয়নগর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে নৌকায় ঘুরছিলাম। সেটি ছিল ভবদহ এলাকা। একটি ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে চলছিল আমাদের নৌকা। পাশেই হাঁটুসমান কাদা জমা একটি রাস্তা। মানুষ সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে চলছে রাস্তাটি দিয়ে। সামান্য দেড় কিলোমিটার রাস্তার একপাশে চিংড়ি চাষের এক বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছে। লাখ লাখ টাকার চিংড়ি, নানা রকমের শাকসবজি ও ফল উৎপাদিত হচ্ছে; কিন্তু বছরের পর বছর রাস্তাটির ওই দুরবস্থার কারণে কয়েকশ' চাষি ও খামারি শুধু দুর্ভোগই পোহাচ্ছেন না, আর্থিকভাবেও লোকসানের শকার হচ্ছেন। কারণ ওই কর্দমাক্ত রাস্তাটি পার করতে সরবরাহ ব্যয় পড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচের সঙ্গে বেশি। আমার কাছে স্থানীয়রা এসে তুলে ধরেন করুণ পরিস্থিতির কথা। আমি তেমন কিছুই করিনি। শুধু বিষয়টি তুলে ধরেছি টেলিভিশনে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর কাছে মৌখিক আবেদনও জানিয়েছি। তার পরপরই রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে। তারা এখন সত্যিই উপকৃত হচ্ছে। এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা আছে, যেগুলো সংবাদ আকারে তুলে ধরার মধ্য দিয়েই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। কোনো কোনো সাংবাদিকের কাছে মনে হতে পারে, সাংবাদিকের কাজ সংবাদ পরিবেশন করা, উন্নয়ন কাজ করে বেড়ানো নয়। আমি তাহলে প্রশ্ন করব, সংবাদ কোথায়? বহু সম্ভাবনায় ভরপুর এই দেশে সংবাদের অভাব নেই। ঘটনার সংবাদই শেষ কথা নয়। যিনি সাংবাদিক তাকে সংবাদ তৈরি করতে হবে দেশপ্রেমের জায়গা থেকে, জনকল্যাণের জায়গা থেকে। লক্ষণীয় যে বিষয়টি নিয়ে বলতে চাইছিলাম তা হচ্ছে, এ দেশে শুধু রাজধানীর সাংবাদিকরাই শহরমুখী নন, আমি দেখছি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকরা সদর ও শহরকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়েই কাজ করে চলেছেন। গ্রামের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে না। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সংবাদের খনিই হচ্ছে গ্রাম। যেখানে আছে সমস্যা, সম্ভাবনা, সাফল্য-ব্যর্থতার হাজারও চিত্র। এগুলো সংবাদ আকারে আসতে পারে না? সাংবাদিকদের আর কিছুই করার দরকার নেই, তার মূল যোগ্যতা লেখনী নিয়েই মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন। বহু কাঙ্ক্ষিত তথ্য অধিকার আইন সংসদে পাস হয়েছে। তথ্য বিচ্ছুরণের প্রশ্নে এটি এক যুগান্তকারী সাফল্য বলা যায়। এই সাফল্য সাংবাদিকদের। তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা এতদিন যেসব জটিলতার মুখোমুখি হতেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার পর তা থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন। কিন্তু একটি বিষয় ভেবে দেখার মতো। তা হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের তথ্যপ্রাপ্তি। তাদের তথ্য অধিকার বা তথ্যের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবে কারা? শহর-নগরের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশ, প্রিন্ট মিডিয়ারও সাফল্যজনক প্রচারণার সুফল দেশের কতভাগ মানুষ পাচ্ছে, এটি ভেবে দেখার বিষয়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর বারোআনা বাস করে গ্রামে। আর চারআনা শহরে। অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১১ কোটি মানুষই বাস করে গ্রামে। যাদের বড় একটি অংশ সব তথ্যপ্রবাহ থেকে দূরে বাস করে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন অনেক দূর এগিয়েছে; কিন্তু তথ্যের বাহন হিসেবে তাদের কাছে কোনো মাধ্যম নেই। তারা না পড়তে পারছে পত্রিকা, না দেখতে পারছে টেলিভিশন। দেশের এখনও ৭০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে রয়েছে। যারা মুদি বা চায়ের দোকানে ডিভিডি, ভিসিডিতে হিন্দি ও ইংরেজি মুভি দেখছে, এখানে তারা তথ্যের জোগান পাচ্ছে না; পাচ্ছে অপসংস্কৃতি। তা সব অর্থেই ক্ষতিকর হয়ে উঠছে। এখন কথা হচ্ছে, গ্রামের মানুষ তথ্য পাবে কীভাবে? হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এ দায়িত্বটি নিতে হবে স্থানীয় সাংবাদিকদের। জেলা শহরের ঘটনার সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সাংবাদিকদের গ্রামের দিকে যেতে হবে, যেতে হবে শিকড়ের কাছে। গ্রামের জনগোষ্ঠী, সাংবাদিক ও শহরের গণমাধ্যম– এই তিনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরি করতে না পারলে আমাদের সাংবাদিকতাকে প্রত্যাশামাফিক গণমুখী করে তোলা যাবে না। অবশ্য বলাবাহুল্য, এর জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলোর আন্তরিকতাও অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোতে মফস্বল সংবাদ যে বহুকাল ধরেই উপেক্ষিত, তা বলাবাহুল্য। বর্তমান সময়ে এসে অধিকাংশ সংবাদপত্রই ভেতরের দুই পাতাজুড়ে সারাদেশের সংবাদ প্রকাশ করে। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, এসব সংবাদের ভেতরেও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি, দুর্নীতির, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক খবরাখবর যে হারে গুরুত্ব পায়, গ্রামীণ উন্নয়নমুখী সংবাদ সে হারে গুরুত্ব পায় না। বর্তমান সময়ে কৃষি নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোর বেশ উৎসাহী প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক ধ্যানধারণার অভাবে তা অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যগত বিভ্রান্তির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। যার প্রতিফল হয় হিতে বিপরীত। এর জন্য একদিকে চাই স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের গ্রামমুখী সাংবাদিকতার দীর্ঘচর্চা, অন্যদিকে প্রয়োজন গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় দফতর থেকেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া। আজ একবিংশ শতকে এসে আমরা উন্নয়নের জন্য যত কথাই বলি না কেন, আমাদের সাংবাদিকতার ধারা হতে হবে গ্রামমুখী। উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি যেহেতু তৃণমূল থেকে ঊর্ধ্বমুখী হোক এমনটি প্রত্যাশা করছি, সেহেতু শহরের অসুস্থ প্রতিযোগিতা কিছুটা পরিহার করে গ্রামীণ সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করা সময়ের দাবি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও টেলিভিশন

ঠিক কখন উন্নয়ন সাংবাদিকতা শুরু হয় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় তা বলা মুশকিল। তবে একটা সময় পৃথিবীতে খাদ্য নিরাপত্তা খুব দুর্বল ছিল, সেই সময়েই বিকাশ ঘটে উন্নয়ন সাংবাদিকতার। পরবর্তী সময়ে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চিন্তাভাবনা চলে

আসছে মূলত ৫০-৬০ বছর আগে থেকে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন ৩০০-৩৫০ কোটি ছিল, তখন সবার মনে ভয় ছিল যে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আসবে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতেই বিশ্বব্যাপী সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। যদিও এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। তবে এই বিপ্লবের মূল কথা ছিল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে কৃষির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

ষাটের দশকে প্রথম এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এই সংক্রান্ত গবেষণার পুরোপুরি ফলটা আসতে শুরু করে ঠিক তারপর থেকেই। নরম্যান বরলগ প্রথম এ সম্পর্কে ধারণা দেন। পৃথিবীর একেক দেশে মানুষের প্রধান খাদ্য একেক রকম। যেমন এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় প্রধান খাবার ভাত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আলু, কোথাও আছে গম-যব, কোথাও বিন ইত্যাদি। যার যেই প্রধান খাদ্য, সেটা ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত সেখানে উৎপাদন কম হতো, কারণ জাতটি ছিল স্থানীয়।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে ক্রমাগত কিন্তু ফসলের উৎপাদন বাড়ছে না। দেশীয় বীজে ফসলের পরিমাণ খুবই কম; যেমন বিঘায় ১০ মণ বা আরো কম। কিন্তু ফসল দরকার বিঘায় ৩০-৪০ মণ। ম্যালথাসের তত্ত্বমতে, জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে। আর খাদ্যে উৎপাদন বাড়ছে গাণিতিক হারে। এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য নরম্যান বরলগ প্রথম কৃত্রিম পরাগায়ন বা ন্যাচারাল ব্রিডিং করে গমের দেশীয় জাতকে উচ্চফলনশীল করার কাজটি করেন। ১০ মণের জায়গায় উৎপাদন বেড়ে যায় ৩০-৪০ মণে। এই প্রযুক্তি দিয়ে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ভিক্ষ কিছুটা প্রতিহত করা হয়েছিল।

যে দেশে গম প্রধান সে দেশে গমের, যেখানে ধান প্রধান সেখানে ধানের কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটিয়ে উৎপাদন বাড়ানো হলো। আমাদের দেশেও এ পর্যন্ত ব্রির ৫৮টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। একে বলা হয় এইচওয়াইভি (হাই ইলডিং ভ্যারাইটি)। দেশীয় জাত চাষ করলে বিঘায় ৮-১০ মণ ধান হয় আর উন্নত জাত করলে ২৫-৩০ মণ হয়। আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষ খেয়েপরে আছে, এটা শুধুমাত্র গ্রিন রেভলিউশনের জন্য। এভাবে নরম্যান বরলগ বিশ্বব্যাপী আশু দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়েছিলেন।

বিশ্বব্যাপী একদিনে এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়েনি। আগে পুরো চাষ ব্যবস্থা ছিল প্রকৃতিনির্ভর। বর্ষার সময় বীজ ফেললে মানুষ একসময় গিয়ে ধান পেত। এখন সারা বছরই পাচ্ছে কারণ কৃত্রিম সেচ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, উন্নতমানের বীজ ও প্রযুক্তিগুলো দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকের মাঝে এই প্রযুক্তিগুলো জনপ্রিয় করতে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে সেই ৭০-৮০'র দশকে। এভাবেই প্রথমদিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা চলে আসে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থার এক আফ্রিকান ডিরেক্টর জেনারেল এখ বেবো প্রথম বলেন, এমন একটা সাংবাদিকতার উদ্ভাবন করতে হবে যারা যার যার দেশে স্থানীয় পর্যায়ে এই প্রযুক্তিগুলোর সম্প্রসারণ করবে। এই পর্যায়ে সাংবাদিক বা মিডিয়া সম্প্রসারকের ভূমিকা পালন করবে। দরিদ্র দেশগুলোকে আমেরিকান এইডের মাধ্যমে পিএলফোরএইটি দিয়ে পুরো জাতিকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এভাবে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে তার উৎপাদন তাকেই করতে হবে। এরপর পিএলফোরএইটির এসব চুক্তি তুলে দিতে হবে। তা না হলে সবাই সব সময় দরিদ্র থাকবে। উনিই প্রথম এই উন্নয়ন সাংবাদিকতার কথা বলেছিলেন। আবার অনেকে বলেন, ফিলিপাইনে প্রথম উন্নয়ন সাংবাদিকতার উদয়।

এখন আমরা উন্নয়ন সাংবাদিকতার একটা পর্যায় পেরিয়ে এসেছি। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে উন্নয়ন সাংবাদিকতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার কথা। থাইল্যান্ডে পণ্যের মূল্য জানার জন্য অ্যাপস রয়েছে। সেদিক থেকে এশিয়ায় কৃষি নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। তবে আমেরিকায় সান টিভি নামে একটি চ্যানেল রয়েছে। এখানে কৃষি নিয়ে যাবতীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ফিলিপাইনের রেডিওগুলোতে কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রতিদিন সকালে কৃষি নিয়ে ভাষণ দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বেশ উৎসাহী।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষি নিয়ে কিছু নির্দলীয় নিরপেক্ষ সংগঠন রয়েছে। যেমন জাপানে রয়েছে জেএ (জাপান অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন)। আমাদের দেশে এরকম একটি সংগঠন প্রয়োজন। দেশে যেগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত রাজনৈতিক ভাবাদর্শে চালিত। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সংগঠন থাকলে কৃষক অধিকার তুলে ধরতে পারত।

এশিয়ায় কৃষি নিয়ে কাজ বিচ্ছিন্নভাবে হয়, বাংলাদেশেও হয়েছে। তবে চ্যানেল আইয়ের মতো কোনো চ্যানেলই এভাবে কাজ করতে পারেনি। মূলধারার সংবাদে কৃষিকে এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি আর কোনো চ্যানেলে।

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও টেলিভিশন

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়গুলোয় বাংলাদেশ দরিদ্র ও অনুন্নত ছিল, ছিল খাদ্য ঘাটতি। এরপরেই ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। সেই সময় আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হতো, প্রযুক্তির প্রসার ছিল না, ফসলে বৈচিত্র্য ছিল না। তখনকার ফসল বলতে ছিল শুধু ধান আর পাট। নতুন দেশ তাই মানুষের মনোনিবেশ ছিল বিভিন্ন দিকে। সেই সময়টাতেই আমি টেলিভিশনে কাজ শুরু করলাম। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০'র আগ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক বা খেলাধুলাবিষয়ক অনুষ্ঠানে কাজ করতাম। একসময় এসে ভাবলাম, টেলিভিশন শুধু একটা বিনোদনের বাক্স নয়। এটা একটা সম্প্রসারক বা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য জাদুর বাক্স হতে পারে, এটা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার বাক্স হতে পারে। এটাকে আমি এন্টারটেইনমেন্ট টুলস হিসেবে ব্যবহার না করে শিক্ষার জন্য ব্যবহার করতে পারি। এরকম একটা চিন্তাভাবনা থেকেই ১৯৮০ সালে এসে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলাম।

১৯৮০'র দশকে আমার মতো একজন তরুণ কৃষি নিয়ে কাজ করবে, এটা অনেকে ভাবতেই পারত না। অনেকেই আমাকে ধিক্কার দিয়েছে– পরিবার, বন্ধুবান্ধব, কাছের মানুষ সবাই। কারণ তখনকার টেলিভিশনের মূল কাজ ছিল বিনোদনকেন্দ্রিক। কিন্তু আমি মাথায় নিয়েছিলাম এইজন্য, আমার দেশের যেসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আছে কৃষিক্ষেত্রে, এই তথ্য যদি আমি টিভির মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে পারি, তাহলে আমি একজন সম্প্রসারকের ভূমিকা রাখতে পারি যেমন রেখেছিলেন আমাদের গবেষকরা, মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা কিংবা কৃষি সম্প্রসারকরা।

আমার মনে হয়েছিল এই টেলিভিশনের মাধ্যমে একটি কথা বললে একসাথে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনছে-দেখছে। অন্য যে কোনো মাধ্যমের তুলনায় টেলিভিশন এক্ষেত্রে অনেকটা শক্তিশালী। ভিজ্যুয়াল মাধ্যম হওয়ায় প্রাযুক্তিক ব্যবহার, সাফল্য ও উদ্ভাবনীগুলো সবাইকে দেখিয়ে দেয়া যায় টেলিভিশনে। আমি সাংবাদিকতার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে সম্প্রসারক হিসেবে ভূমিকা রাখছি। সেরকম একটা ব্রত নিয়ে 'মাটি ও মানুষ' শুরু করলাম।

মাটি ও মানুষঃ শুরুর কথা

মাটি ও মানুষ শুরু করতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলাম, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষির সংজ্ঞা, কৃষকের সংজ্ঞা গোটাটাই খুব ক্ষীণ একটা জায়গায় আবদ্ধ ছিল। কৃষি বলতে ছিল কেবল ধান আর পাট চাষ করা। কৃষক বলতে বোঝা যেত শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা খেটে খায়, গ্রামে থাকে। আমি যেদিন থেকে কাজ শুরু করলাম, সেদিন থেকে আমার মাথায় এলো এ সংজ্ঞাটাকে আমাদের ভাঙতে হবে, ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। না ভাঙলে কৃষি বা কৃষকের উন্নয়ন হবে না। সেই সংজ্ঞা ভাঙতে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কৃষি মানেই ধান আর পাট চাষ নয়। শুধু ধান আর পাট চাষ করলেই কৃষকের পেটে ভাত হয় না, পরনের কাপড় হয় না, বাচ্চা স্কুলে যেতে পারে না। কারণ কৃষকের সেই বাড়তি সক্ষমতা নেই।

তাহলে সমাধান কী? তাদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। নতুন কৃষি ধারণার সাথে আসতে হবে। বাড়ির সামনে উঠোন আছে, সেখানে সবজির চাষ করতে হবে। সেই সময়ে সবজির চাষ বলতে ছিল বড়জোর একটা লাউয়ের মাচা, যা ঘরের কোনা দিয়ে বেয়ে উঠছে। বাড়ির সামনের পুকুর, সেটার পানি খাওয়া হচ্ছে, কারণ সে সময় টিউবওয়েল ছিল না। সেই পুকুরে যে মাছ চাষ করা যায়, এ সম্পর্কেও ধারণা ছিল না। কারণ সবাই ভাবত চাষ তো হয় ধান আর পাটের, মাছের আবার চাষবাস কী? মাছ তো আসে বর্ষাকালে, পুকুরে।

কিন্তু বলা শুরু হলো, শুধু মাছ নয়, ফলের চাষ করতে হবে। পোলট্রির খামার করতে হবে। আগে পোলট্রি ছিল না, পলোর নিচে কয়েকটি মুরগি বা হাঁস ছিল তাদের। খামার করার আইডিয়া ছিল না তাদের। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করার চিন্তাভাবনাও ছিল না। বললাম, গরুর গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে হবে। এসব মিলে সমন্বিত কৃষির চর্চা করতে হবে।

এতগুলো কৃষি সেক্টর নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রতিটি সেক্টর থেকেই কিছু না কিছু আয় হবে। গরুর গোবর শুধু জমিতে ব্যবহার না করে, বায়োগ্যাস করে জ্বালানির কাজ করতে পারে। ওই গ্যাস দিয়ে একই সাথে রান্না ও ঘরের বাতি জ্বালানোর কাজও করা যায়। এই আলো দিয়ে বাচ্চা পড়াশোনা করতে পারে। এভাবে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

শুধু গ্রামের মানুষ নয়, একজন শহুরে যুবকও কৃষক হতে পারে। এমনকি স্বল্পায়ী চাকরিজীবী কিংবা গৃহিণীও কৃষক হতে পারে। বাড়ির ছাদে বা আঙিনায় একটা কেইস কালচার পোলট্রি বা রুফটপ গার্ডেনিং এর মাধ্যমে আয় করা যায়। এভাবে কাজী পেয়ারা, পোলট্রি ফার্ম এলো। যেই তরুণ বেকার ছিল তাকে মোটিভেট করে মুরগির খামার বা মাছের খামারে কাজে লাগানো যায়। এই

শিক্ষিত তরুণগুলোর শিক্ষাকে যদি কৃষি খাতে বিনিয়োগ করা যায়, তাহলে অনেক বেশি রিটার্ন আসবে চাকরির চেয়ে। যে কারণে এখন বাংলাদেশে ৩০ হাজার কোটি টাকার পোলিট্রি ফার্ম, ২৬ হাজার কোটি টাকার মাছের খামার করা সম্ভব হয়েছে। হাজার হাজার তরুণের এর সাথে সংযুক্তি ঘটেছে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কৃষকের সংজ্ঞাটাও ভেঙে গেল।

এরকম ধারণা মাথায় রেখে '৮০ সালে মাটি ও মানুষ শুরু করি। এরকম একটি অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য ১৯৮০'র দশকে কী ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট লাগে, তার পুরোটা অনুমান করাও সম্ভব নয় এখন। ন্যূনতম দুই দিন লাগত শুটিং করতে। ভারী ভারী সব যন্ত্রপাতি ছিল তখন, একটা ভিসিআর তিনজন মিলে তুলতে হতো, ক্যামেরা দু'জন মিলে ধরত। এরকম জিনিসপত্র নিয়ে গ্রামে গেলে মানুষ স্বভাবতই ভয় পেত, দৌড়ে পালিয়ে যেত। কারণ এগুলো তারা আগে দেখেনি।

কৃষির বাজারজাতকরণ

এরপর চিন্তা করলাম কৃষকের পণ্যের বাজারজাতকরণ নিয়ে। শুরু করলাম পলিসি লেভেলের কাজ। উৎপাদন তো সে করলো। তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পেল কিনা, উৎপাদিত পণ্য নিয়ে সে মার্কেট প্লেস পেল কিনা, এটা হলো মাটি ও মানুষের নেক্সট জেনারেশন।

দেখলাম, কৃষক তার উৎপাদিত ফসল ধরা যাক বাঁধাকপি বিক্রি করছে ৩ টাকায়। আর সর্বশেষ ক্রেতার কাছে এসে তা দাঁড়ায় ৩২ টাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক ও সর্বশেষ ক্রেতা। আর মাঝখান দিয়ে বিশাল একটা অঙ্ক চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে। এটাই হচ্ছে ব্ল্যাকমানি। মধ্যস্বত্বভোগী একটা সিস্টেম। কৃষক নিজেও অনেক সময় মধ্যস্বত্বভোগী। এটাকে কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমি খেয়াল করলাম নরসিংদীর একটি জমিতে কৃষক একটি বাঁধাকপি উৎপাদন করে পাইকারের কাছে বিক্রি করল, বেলাবো বাজারে এসে তা হলো ১০ টাকা। এভাবে বিভিন্ন হাতবদল হতে হতে ঢাকার শান্তিনগরে এসে সেই বাঁধাকপির দাম হলো ৩২ টাকা। এই কথাগুলো শুরু করেছিলাম ২০০৪ সালে 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'-এর প্রথম অনুষ্ঠানে। বিষয় ছিল কৃষকের পণ্যের মূল্য। এর আগে কোনোদিন কৃষকের পণ্য নিয়ে কথা বলা শুরু হয়নি। ওই থেকে মিডিয়া এ বিষয়ে কনসার্ন হলো। আর এগুলো প্রচার করা শুরু করল।

বাংলাদেশ শুরুতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। সেখানে বাংলাদেশ এখন চাল রপ্তানি করছে। নগরায়ণ হলেও সব মানুষ এখনও নগরের বাসিন্দা হয়ে ওঠেনি। বেশির ভাগ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করে। এমনকি পুরো পৃথিবীটা এখনও গ্রামপ্রধান।

শহরে আমরা যারা আছি, তারা আনন্দ করছি, ভালো খাচ্ছি কিংবা থাকছি। এটা আসলে উন্নয়নের আংশিক চিত্র বা ভঙ্গুর চিত্র। এটা কখনোই টেকসই উন্নয়ন নয়। কতদিন দাতাগোষ্ঠীর অর্থ দিয়ে চলবে। ওই কালো টাকা কিংবা মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে থাকা টাকা চলে যাচ্ছে সমাজের এমন একশ্রেণির কাছে, যারা কখনোই সমাজের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখে না। এই টাকাগুলো চলে যাচ্ছে বিদেশে। এই জায়গায় দরকার ডিস্ট্রিবিউশন অব ইকুয়ালিটি। এগুলোই হলো মিডিয়ার উন্নয়ন সাংবাদিকতার ক্ষেত্র।

এখনও বাংলাদেশের ১১ কোটি মানুষ গ্রামে বাস করে। কিন্তু যতটুকু তাদের ভালো থাকার কথা ততটুকু ভালো সে নেই। সে জানে না এত কষ্ট করে ফসল ফলানোর পরও ন্যায্যমূল্য তার ঘরে আসবে কি না। তার অনেক দ্রব্যেরই ক্রয়ক্ষমতা নেই অথচ সে উৎপাদক। আজ যদি তার কেনার ক্ষমতা থাকত তাহলে তার কথা চিন্তা করে বেশ কিছু শিল্পকারখানা তৈরি করা যেত। আমার তো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কথা চিন্তা করে সবকিছু বাইরে থেকে ইমপোর্ট করার দরকার নেই। আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনে ইকুয়ালিটি নেই দেখেই এ অবস্থা।

পাশাপাশি কৃষকের পণ্যে নেই কোনো ভ্যালু এডিশন। টমেটো বেশি উৎপাদন হয় কিংবা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৩০ টাকা দামের এক কেজি টমেটোতে বড়জোর সালাদ বা তরকারি হচ্ছে। কিন্তু টমেটো যখন ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সেটা বোতল হয়ে বেরিয়ে আসছে তখন এর দাম হচ্ছে ২৩০ টাকা। এভাবে বেশির ভাগ পণ্যের ভ্যালু এডিশন হয়নি। যদি তাই হতো, তবে কৃষক এ থেকে বেশ কিছু টাকা-পয়সা পেত।

কৃষক একদিকে মূল্য পাচ্ছেন না, অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য বাইরে থেকে অনেক কিছুই আমদানি করতে হচ্ছে। তাহলে সরকারের দায়িত্ব কী? আমদানি বন্ধ করতে না পারলেও নিরুৎসাহিত করতে পারে। যে সময় কৃষকের ফসল বাজারে উঠে, ওইসময় উচ্চহারে কর আরোপ করে ইমপোর্টারকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এভাবে ১১ কোটি মানুষের কাছে যদি ন্যায্য পাওনা যেত, তাহলে বাংলাদেশের চেহারা আজ কী হতো? ওটা হতো টেকসই অর্থনীতি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা অনেকটা ইন-ডেপথ বিষয়, এখানে কাজ করার অনেক জায়গা রয়েছে! বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে তিনটি অর্থনৈতিক স্তম্ভের ওপর– গার্মেন্টস, রেমিট্যান্স ও কৃষি। এর মধ্যে সবচেয়ে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব কৃষিতে। কিন্তু এই কৃষি বা কৃষককে আমরা কতটুকু মূল্যায়ন করছি? গার্মেন্টস, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, কিছু রেমিট্যান্স দেয়া ছাড়া বেশির ভাগ অর্থই যাচ্ছে এর মালিকের কাছে। এই গার্মেন্টসের বেশির ভাগ শ্রমিকই হলো দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। বিদেশ থেকে যারা রেমিট্যান্স পাঠায় তাদেরও মোটামুটি ৯০ ভাগই হলো গ্রামের সন্তান। তাদের টাকাটাই কৃষির সাথে সম্পর্কিত। ৫০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের টাকাও এসে জুড়ে যাচ্ছে এই কৃষিতে। রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে ব্যবসায়ীদের কৃষিতে বিনিয়োগ করানোর জন্য। বিনিয়োগ করলে বাংলাদেশের চেহারাটা কেমন হতো, তা বোঝা যায় নাটোরে প্রাণের বিনিয়োগের কথা চিন্তা করলে। ডাল আর মটরদানার চাষ করার মাধ্যমে তারা তাদের ভাগ্যের উন্নতি করেছে। আমের ক্ষেত্রেও তাই। গাছ থেকে পড়ে যে আম নষ্ট হচ্ছে, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে বিশাল জুসের ফ্যাক্টরি। এরকম কত ধরনের ফসল হচ্ছে, যেগুলোয় ভ্যালু এডিশন করলে অনেক বেশি লাভ হতো কৃষকের।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আগামীর স্বাস্থ্য, কৃষি কীভাবে পরিবর্তন হবে, এটাও দেখা উচিত আগামী দিনের উন্নয়ন সাংবাদিকদের। শুধু ক্রাইম বিট বা পলিটিক্যাল বিট করাই সাংবাদিকতা নয়।

বৈশ্বিক গণমাধ্যমের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, গণমাধ্যম যদি একটু একটু করে সমাজে অবদান রাখত তাহলে এই পৃথিবীর মানুষ আরো উন্নত হতো। আর গণমাধ্যম সবচেয়ে বড় অন্যায় করছে কৃষিকে অবহেলা করে। দুর্যোগের আগে কৃষি সম্পর্কে গণমাধ্যম সচেতন হয় না। এ কারণে গণমাধ্যমকে অনেক চিন্তাশীল জায়গা থেকে কাজ করা দরকার। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, প্রকৃতি এগুলোর দিকে চোখ রাখা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের তরুণ সাংবাদিকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

কৃষক শুধু খাদ্য উৎপাদনের যন্ত্র নয়, তারাও রক্তমাংসের মানুষ। তাদেরও আনন্দ-বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে ধাপে ধাপে তৈরি করেছি কৃষকের ঈদ আনন্দ। ২৫-২৬টি টেলিভিশনে ঈদের সময় যত অনুষ্ঠান হয়, সবই নগরপ্রধান। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে কোনো অনুষ্ঠানই কৃষকদের নিয়ে হয় না। আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো করি কৃষকের ক্ষমতায়নের জন্য। তারা নিজেদের যেন ছোট না ভাবে। এমনকি আয়োজন করি কৃষকের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট বিশ্বকাপ।

বেশি ফসল ফলাতে ফলাতে মাটি যেমন জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তেমনি কৃষকও অনেক কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন। কৃষক এরকম নানা ধরনের অকুপেশনাল হ্যাজার্ডসের মধ্যে পড়ছেন। বাংলাদেশের কৃষক গামবুট, গ্লাভস কিংবা মাস্ক ব্যবহার করেন না। অন্যান্য উপকরণের মতো এই তিনটি জিনিস প্রতিটি কৃষকের ঘরে অবশ্যই রাখা উচিত। কারণ তিনি যে মাটিতে খালি পায়ে হাঁটছেন, সেখানে হয়তো একটু আগে সার বা কীটনাশক ছিটানো হয়েছে। হয়তো আগের দিনই তার পা কাটা গেছে কোনো কাজ করতে গিয়ে। এখন সার মেশানো পানি তার শরীরে ঢুকে পরে তার গ্যাংগ্রিন হতে পারে। সার কোম্পানিগুলোও পারত কৃষকদের একটা করে মাস্ক দিতে। এগুলো করতে পারত যদি মিডিয়াগুলো সচেতন হতো। বারবার হাত দিয়ে চারা বুনতে বুনতে কৃষকের হাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যও আমি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

আমাদের ডাক্তারদের গ্রামে পাঠাতে হবে। তারা কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারবেন। কী কী অকুপেশনাল ও সিজনাল হ্যাজার্ড সম্পর্কে সচেতন করতে পারি, সেটা ভাবা দরকার। তথ্য দিয়ে তাদের সচেতন করতে হবে। পড়াশোনা করে গ্রামে ফিরে গেলে গ্রামের মানুষের সাথে বন্ধন তৈরি হবে। এই বন্ধন এমন অটুট হয়, যে দুই বছর পর যখন গ্রাম থেকে সে ফিরে আসে, তখন সারা গ্রামের মানুষ ডাক্তারের জন্য কাঁদবে। এগুলো নিয়ে আমাদের উন্নয়ন সাংবাদিকদের কাজ করতে হবে।

দেশের অর্থনীতিতে বাজেট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু দেশের ১১ কোটি মানুষের মতামত না নিয়ে নীতিনির্ধারকরা বাজেট তৈরি করে। কৃষককে কী দরকার, এ সম্পর্কে তারা জানেই না। তাদের কী প্রয়োজন, না জেনেই একটা বাজেট দিয়ে দিলে তো সেটা ফলপ্রসূ হবে না। আগে তার কী দরকার, এটা জানার জন্য শুরু করলাম 'কৃষি বাজেট, কৃষকের বাজেট'। এগুলো হলো পুরো একটা প্রসেস।

নগর আর গ্রামের মানুষের বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। উৎপাদক উৎপাদন করেও দু'বেলা খাবার পান না, নগরের মানুষ কোনো অবদান না রেখেই খাবার

খাচ্ছে। আজকের এই করপোরেট প্রজন্ম, যারা জানে না গ্রাম কী, কীভাবে খাবার আসে– তাদের অংশগ্রহণে শিকড়ের কাছে দিতে চেষ্টা করলাম 'ফিরে চল মাটির টানে' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে 'ফিরে চল মাটির টানে, জুনিয়র'। সেখানে কৃষক কীভাবে টাকা আয় করেন, সেই জীবনধারাকে শহরের সাথে রিলেট করতে এই আয়োজন। এভাবে দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে হয়তো যাচ্ছে তিন-চার জন ছেলে-মেয়ে, কিন্তু দেখছে হাজার হাজার মানুষ। মনের দিক থেকে সেখানে রয়েছে লাখ লাখ মানুষ। এগুলোই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্র।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিতর্কিত আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শ। ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক ইবন খলছুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে প্রথম 'উন্নয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেখানে উন্নয়নকে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে কট্টরপন্থী, মার্কসবাদী, উদারনীতিবাদী আর পুঁজিবাদী দর্শনের কারণে 'উন্নয়ন'কে একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গির আদলে বিশ্লেষণ করার ধারাটির পরিবর্তন ঘটে।

'উন্নয়ন' সমীক্ষক ইয়ান সাভাইস বলেছেন, 'উন্নয়নের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। দেশ, কাল ও অঞ্চলের ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারণা নির্ধারিত, পরবর্তী সময়েও পরিবর্ধিত হয়।'

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী পরস্পর নির্ভর তিনটি ঘটনা:
(১) বিশ্বশক্তি হিসেবে ইউরোপের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফাটল
(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'টি বৃহৎ শক্তির উদ্ভব
(৩) উপনিবেশ ধারণা বিলুপ্তি।

এসবের কারণে উন্নয়ন বিষয়ের সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আর উন্নয়নকে তখন এভাবে বলা হয়, একটি নির্দিষ্ট সমাজে বিরাজমান অবস্থায় মানুষের সাধারণ চাহিদার নিবারণ করাকে উন্নয়ন বলে।

তবে বর্তমানে 'উন্নয়ন' বলতে সার্বিক জাতীয় উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়। 'উন্নয়ন' সম্পর্কে সবচেয়ে আধুনিক ধারণাটি হলো- 'মানুষের চরম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে পার্থিব সব বস্তু, উদ্ভিদজগৎ এবং যা কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেগুলোর অনুসন্ধান, গুণ নির্ণয় এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মানবসমাজের যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড তার ফলাফলই হলো উন্নয়ন।'

উন্নয়ন নিয়ে বিবিধ ধারণার মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা'র ধারণাটিও আমাদের সমাজে প্রবেশ করে। এটি সাংবাদিকতার একটি নতুন ধারা। মূলত সাধারণ মানুষের উন্নয়ন নিয়ে যে সাংবাদিকতার চর্চা, তা-ই উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

চার দশক ধরে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' নামে সাংবাদিকতা জগতের এই নতুন ধারাটি বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করছে। উন্নয়ন অভিমুখী দেশগুলো যেমন- ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এমনকি বাংলাদেশেও এ ধরনের সাংবাদিকতার প্রসার ঘটছে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশনের বেশকিছু অংশজুড়ে যেমন- সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংবাদ এলাকা এবং বেতার টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ সময় উন্নয়নবিষয়ক সংবাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। [সূত্র: দৈনিক সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন: আলী রিয়াজ জাফরীন জেরি চৌধুরী মার্চ ১৯৯৫, নিরীক্ষা, সারণি -৩, পৃষ্ঠা, ৬৭-৬৮]

উন্নয়ন গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রপঞ্চ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ষাটের দশকের আগে এ ধারণাটি ছিল না। ষাটের দশকের সাংবাদিক তারজি বারীন্দ্র বিত্তচি প্রথম 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভাবন ঘটান। তাঁর উদ্যোগে লোস বার্নোস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক মাকার্তো চাক্কি Dep:hnews নামে একটি ফিচার সার্ভিস সংস্থা শুরু করেন। প্রথাগত সাংবাদিকতার বদলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই এ সংস্থার প্রধান কাজ ছিল। তাঁদের এই সংস্থার কার্যকলাপ থেকেই উন্নয়ন সাংবাদিকতায় তিনটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলো হলো:
(i) উন্নয়ন
(ii) শিক্ষা
(iii) জনসংখ্যা

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি আগে এলেও ১৯৬৭ সালে ফিলিপাইনে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লোম বার্নোস ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন যোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক নোরা সি কেব্রাল, সহকর্মী হুয়ান এম জেনিয়াস আর ফিলিপাইন প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক হওয়ান মারকোদা, সাংবাদিক অ্যালেন বি চাক্কি এ শব্দটির ও ধারণার সূচনাকারী। এরপর প্রেস ফাউন্ডেশনে অব এশিয়া নামক সংস্থার উদ্যোগে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়টি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদি নিয়ামকগুলোকে জনসম্মুখে তুলে ধরা। এ ধরনের সংবাদে সমাজের নেতিবাচক কিংবা উত্তেজনাকর বিষয়ের চেয়ে 'উন্নয়ন' বিষয়টি প্রধান্য পাবে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়ে সাম্প্রতিক সংজ্ঞাটি দিয়েছে 'থমসন ফাউন্ডেশন', যা অনেকটা এরকম-

'উপযুক্ত/ প্রয়োজনীয় ও যথার্থ তথ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের গ্রাম ও শহরের অগ্রগতি বা অগ্রগতির পথে বাধাগুলো পাঠযোগ্য করে প্রতিবেদন রচনাকে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলা যায়। উন্নয়ন সাংবাদিকতা কর্তৃপক্ষ জানায় অথবা শহর ও গ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন করে, যা জনগণের জীবনযাত্রার মান্নোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।'

উদাহরণ:
(i) 'নারীরা এখন ট্রেনচালক'
(ii) এবার সারা দেশে রেকর্ড পরিমাণ আলুর ফলন হয়েছে।
(iii) নতুন প্রজাতির বীজের সন্ধান
(iv) পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন হিনা

উপরের সব শিরোনামেই সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটি উন্নয়নবিষয়ক সংবাদ।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য:
১। উন্নয়নকে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে জানিয়ে দেয়া
২। জণগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো
৩। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ
৪। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সবাইকে অভিহিত করা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা 'প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ':

'৮০-এর দশকের শেষভাগে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়টি এদেশের সাংবাদিকতা চর্চাকে আলোড়িত করে। দেশজ উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার মানসেই এদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতার সূচনা ঘটে। আর তার ব্যাপক প্রসারের নিমিত্তে দেশের প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগ আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' কোর্সটি রয়েছে। বাংলাদেশে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতার' চর্চার গতি কেমন তা নিয়ে সীমা মোসলেম, 'সংবাদপত্রে গ্রাম ও শহরের সংবাদ প্রবাহের পরীক্ষা- নিরীক্ষা' অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৮৭; সীমা মোসলেম 'সংবাদপত্রে মমস্বলের খবর: ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ' নিরীক্ষা; মে- জুন, ১৯৯৯ সহ বেশ কিছু গবেষণা হয়। আর ১৯৯৩ সালের জুনে পরিচালিত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের 'সংবাদপত্র ও পাঠকের চাহিদা' শীর্ষক সমীক্ষায় দেখা যায়, পাঠক রাজনীতির সংবাদ বেশি চায় এবং তার পরই উন্নয়নমূলক সংবাদ। তবে 'নিরীক্ষা মার্চ-১৯৯৫' এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন: আলী রিয়াজ ও জাফরিন জেরিন চৌধুরীর প্রতিবেদন অনুসারে কোনো সংবাদপত্রের ১০ শতাংশের বেশি এলাকাজুড়ে উন্নয়ন সংবাদ প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ পাঠকের মধ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত সংবাদের চাহিদা থাকলেও সে অনুযায়ী 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' চর্চার পরিমাণ কম।

আমাদের দেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতার অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো জনগণকে শেখানো, তাদের প্রভাবিত করা কিংবা উদ্দীপিত করা। এ কারণে নারী নির্যাতন কিংবা ইভটিজিংয়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয় বরং কীভাবে এ বিষয়ে আইনি সহায়তা পাওয়া যাবে, প্রতিরোধের উপায় কী হতে পারে, তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ কী হবে– এ তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন লেখা হলে কেবল সেটাই হবে 'উন্নয়ন সংবাদ'। তাই ঢাবি শিক্ষক রোমানা মনজরের নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে পত্রিকায় সেভাবে লেখা হয়েছে তা কখনো উন্নয়ন সাংবাদিকতার মধ্যে পড়ে না বরং এ প্রতিবেদনে যদি এমন ঘটনার প্রতিরোধবিষয়ক কিংবা সচেতনতা তৈরির দিকনির্দেশনা দেয়া হতো, তবে সেটি উন্নয়ন সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত হতো। কারণ Elisabe:h Ribbans (গার্ডিসন-এর সম্পাদক) বলেন 'Developement Journalism is more Complex and lobour intensive'.

উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ:

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রসমূহ ক্রমানুসারে দেয়া হলো, পাশাপাশি কারণও বর্ণিত হলো:

১। কৃষি সংবাদ: আমাদের দেশে 'উন্নয়নবিষয়ক সংবাদ' বলতে অনেকেই শুধু কৃষি সংবাদকেই মনে করেন। কারণ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিকাজের সাথে জড়িয়ে আছে এদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রা, তাই কৃষির উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করে। যেমন: এবার উত্তরবঙ্গে আমের বাম্পার ফলন হয়েছে' সংবাদটি শুনেই মনে হয় দেশ হয়তো এগিয়ে যাচ্ছে। আর গণমাধ্যমও তাই এমন সংবাদকে গুরুত্ব দেয়।

২। নারীর ক্ষমতায়ন: বর্তমানে আমাদের সমাজের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো নারী নির্যাতন। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মনজুরের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতন সমাজের নেতিবাচক চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এমন সমাজে যদি নারীর ক্ষমতায়নবিষয়ক সংবাদ দেয়া হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। যেমন: নারী রেলচালক, নারী পুলিশ কর্মকর্তা। পাশাপাশি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মাঝে যখন তাদের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ সংবাদ প্রকাশিত হয়, তখন তা সে দেশের উন্নয়নকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৩। শিক্ষাবিষয়ক সংবাদ: 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'; যে কোনো জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার প্রসার। তাই শিক্ষার প্রসার সংক্রান্ত সংবাদগুলো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নবিষয়ক সংবাদ হিসেবে সমাদৃত।

৪। প্রকল্প কর্মকাণ্ডবিষয়ক সংবাদ: 'বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন বিদ্যুতায়ন প্রকল্পর নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে জাতীয় উন্নয়নের জন্যই করা হয়েছে। তেমনি জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বৃহত্তর ও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে লিখিত প্রতিবেদনগুলো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংবাদ। আর আমাদের দেশের জন্য এগুলো উন্নয়ন প্রতিবেদনের বিচক্ষণ ক্ষেত্র।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নবিষয়ক সংবাদ: বর্তমানে উন্নয়ন বলতে মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বোঝায়, তাই এটিও উন্নয়ন সাংবাদিকতার চর্চার সংগত ক্ষেত্র। আর উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটিই এসেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য (উৎস Depthnews প্রতিষ্ঠার কারণ)। তাই আমার দৃষ্টিতে কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংবাদের পাশাপাশি এ ধরনের সংবাদও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংবাদ।

৬। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: মানবসম্পদ একটি শক্তিশালী সম্পদ হিসেবে নানা দেশে অভিহিত হলেও আমাদের দেশে গণমাধ্যম সমূহের নীতিকথা হলো: 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুইটি সন্তানই যথেষ্ট' আর দু'টি হলে আর নয়, একটি হলে আরও ভালো'; যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে জণসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা আর সফলতা নিয়ে লিখিত সংবাদ উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

৭। সাফল্য প্রতিবেদন: ব্যক্তির সাফল্য নিঃসন্দেহে সমাজের সফলতার ক্ষুদ্রতর রূপ, যা সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তাই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সেরাদের কথা গণমাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এছাড়া সাদা মনের মানুষ শীর্ষক প্রতিবেদনগুলোও সাফল্য প্রতিবেদনের উদাহরণ।

৮। উন্নয়ন নীতিমালা: যে কোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুসংগঠিত নীতিমালা যেমন: নারী উন্নয়ন নীতিমালা, পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা, শিক্ষানীতি এসব নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন কিংবা বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন উন্নয়ন সাংবাদিকতার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

৯। পরিবেশ: পরিবেশও উন্নয়ন সাংবাদিকতার অন্যতম ক্ষেত্র। কারণ পরিবেশ বিপর্যস্ত করে সামগ্রিক উন্নয়ন কোনো ভালো ফলাফল আনতে পারে না। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটন শিল্পের প্রসারে ভূমিকা রাখতে পারে।

১০। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: 'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে চলার গতি'। অর্থাৎ আমাদের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে অনেকটা বিজ্ঞানের কারণে। যেমন: 'সোলার এনার্জির আবিষ্কার' কিংবা 'বাঁশ দিয়ে টিউবওয়েলের উদ্ভাবন', সবকিছুই বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের উদাহরণ। এগুলোও উন্নয়ন সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদন।

কীভাবে করবো 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা'

উন্নয়ন সংবাদ লেখার জন্য থমসন ফাউন্ডেশন (১৯৯৩) প্রতিবেদক/ সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসু মন, উত্তম সাক্ষাৎকার নেওয়ার কৌশল আত্তীকরণ গবেষণা বা সমীক্ষা চালানোর ধরন অথবা লেখার ভালো গুণের কথা বলেছে। আবার Kamath ১৯৯৬ সালে বলেন, 'শুধু নোট নিলে চলে না, চাই পর্যাপ্ত ব্যাপক ভাণ্ডার' নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ, রেডিও শোনা এবং টেলিভিশন দেখাও উন্নয়ন সাংবাদিকতার জন্য অপরিহার্য।

কোনো উন্নয়ন প্রতিবেদন লিখতে হলে প্রতিবেদককে কী কী কার্যকলাপ অনুসরণ করতে হবে, তা নিম্নে বলা হলে:

ক. সংবাদসূত্র ব্যাপকতর করা: উন্নয়ন প্রতিবেদন লেখার জন্য প্রতিবেদককে বিভিন্ন স্তর ও ব্যাপক পরিসরে যোগাযোগ গড়ে তুলে সংবাদসূত্রের পরিবর্ধন করা প্রয়োজন। ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, পণ্যের ডিলার, বীমা প্রতিনিধির পাশাপাশি শিপিং এজেন্ট, অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পরিবহন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ চাষি কিংবা কৃষক সমাজের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করা উচিত। কারণ তারা সবাই উন্নয়ন প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হতে পারে।

খ. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল: মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, বন গবেষণাগার, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা কেন্দ্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ, ইউএসডিপি আইন এলও ইউনিডো, ইউএনএফপিএসহ সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণালবন্ধ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংবাদ হতে পারে। তাই প্রতিবেদকের কাছে এদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন।

গ. পেশাদার বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যোগাযোগ: পেশাদার মহল উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয় উপকরণ। তাই পরিসংখ্যানবিদ, স্থপতি, বিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী, আইনজীবীসহ সবার সাথে সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঘ. জ্ঞানচর্চা: উন্নয়ন সাংবাদিকতার তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার বেশি, তাই প্রতিবেদককে তথ্য সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ তথ্যগুলো তার প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করে।

চ. সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি। কারণ প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন সাংবাদিক বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত নির্ধারিত বিষয়ে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এভাবে তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার পর উন্নয়ন প্রতিবেদক কীভাবে তার প্রতিবেদনটি লিখবেন, তা বলতে গিয়ে '৬০-এর দশকের সাংবাদিক যদি তার প্রতিবেদনে প্রকল্প বা ইস্যুর পটভূমি, উপাদান এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগ করেন, তাহলে সেই প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো প্রতিবেদন হবে।

অর্থাৎ উন্নয়ন সংবাদে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন হয়। আর এক্ষেত্রে গতানুগতিক সংবাদ লেখার নিয়ম অনুসরণ না করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সহায়তা নেয়া প্রয়োজন আর সেক্ষেত্রে প্রতিবেদক একটি ভালো সাক্ষাৎকারেরও প্রয়োগ করতে পারেন।

উন্নয়ন সংবাদ সাধারণত Indepth news হয়ে থাকে। এ ধরনের সংবাদে বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত সংবাদে সমস্যাগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়; কিন্তু উন্নয়ন সংবাদে নির্ধারিত বিষয়টির পটভূমি, কী হচ্ছে, কীভাবে হওয়া উচিত এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা বিচার-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল কথা। এর আলোকে বলা যায়, উন্নয়ন সংবাদ হলো তথ্যনির্ভর সংবাদ।

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিস্তৃত ও ব্যাপক আকারে গবেষণায় ফলাফলই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এর জন্য প্রয়োজন সংবাদের গভীরে প্রবেশ করে সংবাদের ভেতরের সংবাদ তুলে আনা। অর্থাৎ যে কোনো সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সম্যার কারণ ও সমস্যা সমাধান পথও তুলে ধরা। সংক্ষেপে নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য, পরিসংখ্যান তুলে ধরাসহ তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক ও অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করার নাম হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

উন্নয়ন সংবাদ ফিচারধর্মীও হতে পারে। গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা, ব্যর্থতা ও সাফল্য গল্পসহ অসীম সাহসিকতার বিষয় নিয়েও এমন প্রতিবেদন হতে পারে। এজন্য নেপালি সাংবাদিক Kunda Dixit মনে করেন, উন্নয়ন সাংবাদিকতা চর্চার জন্য ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন- সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে হলে তাদের কাছাকাছি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় চাহিদাকেও বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন সংবাদ কোনো প্রশংসামূলক সংবাদ নয় বরং এটি গঠনমূলক সমালোচনাত্মক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ।

লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই

উন্নয়ন সাংবাদিকতা সময়ের প্রয়োজনে

শামীমা চৌধুরী

ভূমিকা

টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব মানুষের জন্য একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সর্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ। এতে আছে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা। এর মধ্যে ১৭ নম্বর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে বলা হয়েছে লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্বের কথা। এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ হয়েছে, সামাজিক কার্যক্রমে সমাজের সব পর্যায় ও আন্তঃআঞ্চলিক

সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ উপযোগী সাংবাদিকতা হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা, যা প্রতিদিনের সংবাদকে ফোকাস না করে দির্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াই উন্নয়ন সাংবাদিকতার অংশ

অংশীদারিত্ব, অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, আঞ্চলিক [এলাকা] সম্পর্ক উন্নয়ন করা, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে উন্নয়ন টেকসই হয়। আর এই অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বর্তায় স্বাধীন ও উন্নয়নমুখী যোগাযোগ কার্যক্রমের ওপর। যে কাজটি করে থাকেন গণমাধ্যমকর্মীরা। আর এখানেই উন্নয়ন সাংবাদিকতার বাস্তবতা। যেখানে গুরুত্ব পায় আর্থসমাজিক উন্নয়ন-অগ্রগতি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার সংজ্ঞায়ন

সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ উপযোগী সাংবাদিকতা হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা, যা প্রতিদিনের সংবাদকে ফোকাস না করে দির্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াই উন্নয়ন সাংবাদিকতার অংশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি, শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, নারী-পুরুষের সমতা, শিশু উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, শিশুমৃত্যু হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, শিল্প ও শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক অসমতা হ্রাস, টেকসই নগর উন্নয়ন, বনাঞ্চলের উন্নয়ন, জলজ জীবন, জলবায়ু, শান্তি, ন্যায়বিচার– এই বিষয়গুলো নিয়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতা উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত সাংবাদিক Walter Lippmann মনে করেন, 'যেখানে সাংবাদিকরা জনগণ ও নীতিনির্ধারণী এলিটদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, সেটিই উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেছেন, 'যেখানে গণমাধ্যমকর্মীরা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে এলিট শ্রেণি-সবার কথা শুনে, দেখে এবং জনগণকে শোনার, দেখার এবং পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। সরকার/পলিসি মেকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে সরকারের সঙ্গে জনগণ যোগাযোগ করে এবং সরকারও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এর মধ্য দিয়েই কার্যকর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। গ্রামীণ জনগণকে সমর্থন দেওয়া, অধিকারহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং ভয়েসলেস মানুষকে ভয়েস দেওয়ার কাজটিও হয় সাংবাদিকদের হাত ধরে। পাশাপাশি সরকারকে দায়বদ্ধ রাখা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা, সমাজের ওপর প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে জনগণ গণমাধ্যম থেকে তথ্য নিয়ে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে পারে, সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগী কার্যক্রম, নীতি মূল্যায়ন করতে পারে, তথ্য পাওয়ার মধ্য দিয়ে যে কোনো বিষয়ের কারণ ও প্রভাব অনুধাবনে সক্ষমতা লাভ করে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা যেভাবে শুরু

একটি রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে উন্নয়ন সাংবাদিকতার আত্মিক বন্ধন। বিশ্বের সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিষয়টি এসেছে অনিবার্যভাবে। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোয়। তবে এটি দীর্ঘদিন সরকার ও সমাজের শীর্ষ ও প্রান্তিক পর্যায়ে সেতুবন্ধ হিসেবে তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি।

মূলধারার সংবাদপত্র মূলত বাণিজ্যিক প্রকাশনাই গুরুত্ব পেয়ে আসছিল। যেখানে সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রথম পাতায় প্রকাশিত হতো না গুরুত্বের সঙ্গে। পশ্চিমা ধাঁচের সাংবাদিকতা অনুসন্ধানমূলক হলেও এগুলো জনমুখী কোনো ইস্যুতে অ্যাডভোকেসি করত না। বেশির ভাগ বিদেশি সংবাদদাতা তাদের নিজস্ব পরিবেশ, সমাজকাঠামো, সংস্কৃতির গণ্ডির আবহে ও পরিপ্রেক্ষিতে অন্য দেশের, সমাজের, গোত্রের ও সংস্কৃতির সংবাদকে বিবেচনা করে আসছিল দীর্ঘদিন। ১৯৮৫ সালের দিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে বিকল্প সাংবাদিকতা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। এর প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল জাতীয় উন্নয়ন। বিশেষ করে কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি। উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে অনেক সময় 'কমিউনিটি অরিয়েন্টেড' সাংবাদিকতা হিসেবেও ধরা হয়, সেখানে প্রান্তিক মানুষের কথা থাকবে।

66

পশ্চিমা গণমাধ্যম একসময় মনে করত, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টর্নেডো, হারিকেন, নদীভাঙন, বন উজাড় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়। এগুলো খবর, কিন্তু এসব সমস্যা কেন দেখা দেয়, এসব বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণই বা কী, সেসব তথ্য খুব কমই প্রকাশিত হতো

99

বিশিষ্ট গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Aggarwala'র The Third world and press freedom গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা হলো নতুন ধরনের অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন। উন্নয়ন প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কাজ হলো সংবাদের বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করা, মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় চাহিদা মাথায় রাখা। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য, সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুবিধা ও জনগণের ওপর এর সত্যিকারের প্রভাব– এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবসম্মত, সে সম্পর্কে খুঁজে বের করা।

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার সাবেক ম্যাগাজিন এডিটর Alisabeth Ribbans'-এর মতে, Development Journalism is more complex and labour intensive than it might appear. Ribbans আরো বলেন, একজন ভালো সাংবাদিক শুধু বর্ণনা করবে না, অনুসন্ধান করবে, সত্যকে উন্মোচন করবে এবং চাপা পড়া বা অস্পষ্ট বিষয়ের অর্থোদ্ধার করবে। উন্নয়ন সাংবাদিক Villanilam মনে করেন, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে এমন দেশের জনগণের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করতে কিছু প্রজেক্ট ও কর্মসূচি চালু করার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাংবাদিকতাই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

পশ্চিমা গণমাধ্যম একসময় মনে করত, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টর্নেডো, হারিকেন, নদীভাঙন, বন উজাড় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়। এগুলো খবর, কিন্তু এসব সমস্যা কেন দেখা দেয়, এসব বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণই বা কী, সেসব তথ্য খুব কমই প্রকাশিত হতো। পাশ্চাত্য স্টাইলের রিপোর্টিংকে অনেক বিশ্লেষক 'ডিজাস্টার জার্নালিজম' বলে উল্লেখ করতেন। এখানে ঘটনার দ্রুত ও ট্র্যাজিক ঘটনা থাকে, ঘটনার নাটকীয় ছবি দেখানো হয় কোনো পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই। ঘটনার অন্তরালে কী হয়েছে, তার বর্ণনা থাকে না। ঘটনার পেছনের কোনো তথ্য থাকে না এবং এ কারণে কোন কমিউনিটি বা সমাজ এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার উল্লেখ থাকত না। তবে এই সীমাবদ্ধতা বেশিদিন টিকে থাকেনি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা যেভাবে শুরু

উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে পাঁচ দশকের বেশি সময়। ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল– এ দেশগুলোয় উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। উন্নয়ন সাংবাদিকতা যে একটি পৃথক সংজ্ঞায়নের মধ্যে পড়ে, সেই ধারণা ১৯৬৩ সালে এশিয়া অঞ্চলের প্রখ্যাত সাংবাদিক জোয়ান মাকার্তো ও অ্যালান চকলি

তুলে ধরেন। ফিলিপাইনের লস বানোস বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা নিয়ে সত্তর দশকে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা হয়। আর এভাবে গত শতকের ষাট ও সত্তর দশকে এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি গ্রহণযোগ্যতা পায়। অনেক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ এটিকে 'অ্যাডভান্সিং জার্নালিজম' হিসেবেও ব্যাখ্যা করেন। সামাজিক ন্যায্যতা ও হিতকর সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ধরা হয় উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে। এটি কোনো কল্পনাসুলভ সাংবাদিকতা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষক তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না, চালের মূল্যবৃদ্ধি। ভোক্তা চড়া দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এসব সমস্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে উন্নয়ন সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়ন সাংবাদিকরা দেশের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। কর্তৃপক্ষ (সরকার বা বেসরকারি মালিক) এবং তাঁরা জনগণের মধ্যে তথ্য সেতুবন্ধ সৃষ্টি করছে। দীর্ঘমেয়াদে এটির লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখা। এ ধরনের সাংবাদিকতা শুধু সম্ভাবনাকেই তুলে ধরে না বরং উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলোও তুলে আনে।

বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জের ভেতরে উন্নয়ন সাংবাদিকতা

বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতার চর্চা বাড়ছে এবং উন্নয়নশীল অনেক দেশে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে সাংবাদিকতার এই ধরন নিয়ে অনেক সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। ১৯৬০ ও ৭০ দশকে স্বাধীন হওয়া কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করেছে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। উন্নয়নশীল অনেক দেশে এখনও এই চর্চা রয়েছে। এটিকে তারা প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এ সূত্র ধরেই উন্নয়ন সাংবাদিকতা সমালোচিত হয়েছে এবং পশ্চিমা সাংবাদিকরা উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে 'এন্টি-ওয়েস্টার্ন জার্নালিজম' বলে উল্লেখ করেছে। উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে ঘিরে যেসব বিতর্ক বা সমালোচনা রয়েছে তা হলো:

* গণমাধ্যম সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে। ফলে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম সরকারের কার্যক্রমের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম ক্রিটিক্যাল হয় এবং সমাজে মিডিয়া তার 'ওয়াচডগ' ভূমিকা থেকে সরে আসতে পারে।
* বাস্তবে উন্নয়ন সংবাদ তৈরি করতে গিয়ে সাংবাদিকরা শুধু অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা এড়িয়ে যায়।
* ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম'-এর পরিবর্তে সাপোর্টিং জার্নালিজমের চর্চা হয়ে যায় অনেক সময়।
* গণমাধ্যমকে সরকারের যন্ত্র হিসেবে মনে করা হয় এবং গণমাধ্যমের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকে না।
* সামরিক শাসকরা গণমাধ্যমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।
* উন্নয়ন সাংবাদিকতায় যেহেতু কোনো ঘটনার ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ হাজির করে, মূল্যায়ন করে, বিরূপ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখায়, তাই বলা হয় সংবাদ বস্তুনিষ্ঠতার বদলে ব্যক্তিনিষ্ঠতার আদলে রচিত হয়।
* বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উন্নয়মূলক সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্যাকেজ জার্নালিজম/চেকবুক জার্নালিজম'-এর চর্চা বেড়ে যায়।
* সাংবাদিকদের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার চাপ আসে।
* উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের ক্রোধ এবং আক্রমণের শিকার হয় গণমাধ্যম। ফলে লাইসেন্স বাতিল, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি বন্ধ ইত্যাদি সমস্যায় পরে গণমাধ্যম।
    (১) সরকারের ভালো কাজকে সমর্থন জোগাতে গিয়ে গণমাধ্যম সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহিতার ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার হারাতে পারে। আবার সাংবাদিকরা সরকারের অংশ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিষয় যা হতে পারে

উন্নয়ন প্রবাহ সাংবাদিকতা– উন্নয়নের সব তথ্য ও বিষয় এখানে অর্ন্তভুক্ত থাকে। এই সাংবাদিকতায় উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লেখা ও প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে থাকবে–

* খাদ্য নিরাপত্তা
* শিল্পায়ন
* বাণিজ্যের উন্নয়ন
* গণশিক্ষা কার্যক্রম
* সম্পদের সুষম বণ্টন
* অর্থনৈতিক মুক্তি
* সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম
* শিক্ষা
* দারিদ্র্য
* বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন
* পরিবেশ
* সন্ত্রাস
* এইডস
* কমিউনিটি হেলথ (বিশেষ করে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিগুনগুনিয়া, বার্ডফ্লু)
* বেকারত্ব
* প্রাকৃতিক দুর্যোগ
* দুর্নীতি
* সামাজিক বৈষম্য
* কৃষি ও শিল্প
* মানবাধিকার
* নারী অধিকার
* বাল্যবিবাহ
* যৌতুক
* আত্মহত্যা
* আদম পাচার
* আদিবাসী সমস্যা
* শিশু অধিকার
* ইভটিজিং
* মাদকাসক্তি

উল্লিখিত ক্ষেত্রের সমস্যা ও সংকট আমাদের সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা। এসব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা, নীতিনির্ধারকদের সামনে তা তুলে ধরা, সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দেওয়া এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তুলতে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ভূমিকা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতিতে, মানুষের জীবনমান উন্নয়নে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াচডগ হিসেবে গণমাধ্যম চলমান ঘটনাকে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে। তুলে ধরে সামাজিক অন্যায্যতা-অসংগতি। সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এশিয়ার বহু দেশে উন্নয়নের প্রধান শক্তি এখন উন্নয়ন সাংবাদিকতা। যে পথে এখন বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পথচলা।

সূত্র

১. আলম মো. আশরাফুল, উন্নয়ন সাংবাদিকতা : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, নিরীক্ষা, পিআইবি এপ্রিল-জুন, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৬-২৭
২. www.guardian.co.uk/jaurnalism.com What is development journalism.
৩. তৃণমূল জনগোষ্ঠীর তথ্য অভিগম্যতায় কমিউনিটি রেডিও (সেমিনারপত্র) বিএনএনআরসি, ৮.১০.২০১৭
৪. চৌধুরী শামীমা, লোকবেতার, নিরীক্ষা, পিআইবি, জানুয়ারি- মার্চ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯।
৫. চৌধুরী শামীমা, কমিউনিটি রেডিও: সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির ভাবনা, পিআইবি, ২০১২-২০১৩,

লেখক: সিনিয়র রিসার্স অফিসার, পিআইবি

বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগ বাস্তবতা: একটি পর্যালোচনা

মোহা. মাহামুদুল হক

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর বেকারত্ব দূর করে দ্রুত আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিকতায় উত্তরণের অভিপ্রায় নিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও বিশ্বাস করে, মূলধন ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষি ও শিল্পে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা উন্নয়ন সম্ভব। এর ফলে সব শ্রেণির মানুষের উল্লেখযোগ্য আর্থসামাজিক রূপান্তর ঘটবে এবং জীবনমানের সন্তোষজনক উন্নতি হবে। উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করলেও বস্তুত কাঙ্ক্ষিত সামাজিক

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে মানুষ যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে। অর্থাৎ 'সংঘবদ্ধ সমাজের মতোই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ পুরোনো

রূপান্তর এখনো ঘটেনি। কারণ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়ন যোগাযোগের প্রয়োগে মানুষের আচারণিক পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার যোগাযোগ কৌশল প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা হয় না। উন্নয়ন যোগাযোগ ধারণা, উন্নয়ন যোগাযোগের পূর্বশর্ত এবং বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে এসব পূর্বশর্ত কতটুকু পালিত হয়, তা অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

১. উন্নয়ন যোগাযোগ

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে মানুষ যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে। অর্থাৎ 'সংঘবদ্ধ সমাজের মতোই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ পুরোনো। দার্শনিক ও শিক্ষক, মানবকল্যাণকামী আধ্যাত্মিক গুরু এবং সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সকলেই সমাজের আচরণিক রীতি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্নভাবে যোগাযোগ কৌশলকে ব্যবহার করতেন।' (Fraser & Estrada, 1998)।

চল্লিশের দশক থেকে উন্নয়ন যোগাযোগের ধারণাটি পরিচিত হতে থাকে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর প্রায়োগিক ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়। পঞ্চাশের

দশকে ড্যানিয়েল লার্নার, উইলবার শ্র্যাম এবং ইভারেট এম রজার্সের প্রচেষ্টায় উন্নয়ন যোগাযোগ একাডেমিক পঠনপাঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

আধুনিকায়নের দর্শন দ্বারা পরিচালিত উন্নয়ন ধারণায় জনগণের আগ্রহ, চাহিদা ও তাদের আচরণিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নেয়া হতো না। উন্নয়ন যোগাযোগের জনক আইরিশ গবেষক ও লেখক আর্সকাইন চাইল্ডারস (Erskine Childers) এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারত, তানজানিয়া ও মিশরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে চাইল্ডারস বলেন, 'যে কোনো টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য জনগণ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অপরিহার্য (Fraser & Restrepo-Estrada, 1998)।' ১৯৬৭ সালে চাইল্ডারস ও তাঁর সহধর্মিণী থাইল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী মালিকা ভজরথন কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প 'ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট কমিউনিকেশন সার্ভিস ইন ব্যাংকক'-এর নীতিপত্রে চাইল্ডারস বলেন, 'বুদ্ধিদীপ্তভাবে নকশাকৃত এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কোনো উদ্ভাবনও উন্নয়ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যোগাযোগ করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদের নির্মাণ সফল হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এসব সম্পদ ব্যবহারের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় নতুন কৌশল ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিগত উদ্ভাবন যোগাযোগ না করা হয়েছে।' (Fraser & Estrada, 1998)। চাইল্ডারস বলেন, 'উন্নয়ন যোগাযোগ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন বার্তা প্রেরণ করে।'

উন্নয়ন যোগাযোগবিদ নোরা সি কুইব্রাল (১৯৭৫) উন্নয়ন যোগাযোগ সম্পর্কে বলেন, 'একটা দেশের দারিদ্র্য অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিশীল রাষ্ট্রে দ্রুত রূপান্তর এবং সম্ভাব্য বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা এবং মানব সম্ভাবনার বৃহত্তর পরিপূর্ণতা অর্জনে প্রয়োগকৃত মানবীয় যোগাযোগের শিল্প ও বিজ্ঞান।'

ফ্রেজার ও এস্ত্রাদা-রেসট্রেপো (১৯৯৮) বলেন, 'পরিবর্তনের জন্য জনগণকে তাদের অবস্থা ও পছন্দের বিকল্পসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টিতে, দ্বন্দ্ব নিরসনে, ঐকমত্য আনয়নে, পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনায়, জনগণ ও সমাজের উন্নয়নে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতার উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া, কৌশল এবং মাধ্যমের ব্যবহারই হচ্ছে উন্নয়ন যোগাযোগ।'

বেসেটি (২০০৬) বলেন 'আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য যোগাযোগ দক্ষতা, মাধ্যম, মনোভঙ্গি এবং কৌশলের পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিক প্রয়োগই হচ্ছে উন্নয়ন যোগাযোগ।'

২. উন্নয়ন যোগাযোগ মনোভঙ্গিসমূহ (Approaches)

উন্নয়ন যোগাযোগ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন মনোভঙ্গি কাজ করে। কুমারের (২০১১) মতে প্রধান মনোভঙ্গিগুলো হলো:

* পরিব্যাপন/সম্প্রসারণ মনোভঙ্গি
* গণমাধ্যম মনোভঙ্গি
* উন্নয়ন সাপোর্ট যোগাযোগ মনোভঙ্গি
* প্রাতিষ্ঠানিক মনোভঙ্গি
* সমন্বিত মনোভঙ্গি
* উন্নয়ন যোগাযোগের স্থানিক মনোভঙ্গি
* উন্নয়ন যোগাযোগের পরিকল্পিত কৌশল মনোভঙ্গি

উন্নয়ন যোগাযোগের প্রয়োগে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামাজিক যোগাযোগ, শিক্ষামূলক যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠানগত যোগাযোগ– এ তিনটি উপাদান কাজ করে বলে ফ্রেজার ও এস্ত্রাদা-রেসট্রেপো (১৯৯৮) উল্লেখ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া, যা সমাজের জনগণের মধ্যে সংলাপ ও মিথস্ক্রিয়া, অনুচিন্তা, অংশগ্রহণ, ঐকমত্য স্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবর্তনের কর্মপন্থা বিকাশে সহায়তা করে। এটা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উপলব্ধি ও বিশ্বাস অর্জনে জনগণ ও সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তাকারী যোগাযোগ প্রক্রিয়া। অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম, ফ্লিপ-চার্ট, স্থানীয় গণমাধ্যম, সনাতন মাধ্যম যেমন- নাটক, পথনাটক, গান, গম্ভীরা, নাচ প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করা হয় সামাজিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়। উন্নয়ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষামূলক যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আধেয় বা বার্তা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বিশেষ করে অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে, শেখাতে ও স্মরণ করাতে সহায়তা করে শিক্ষামূলক যোগাযোগ। প্রশিক্ষণমূলক প্রকল্পের সব স্তরে এ যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়, এনজিও ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগসহ সবার মধ্যে তথ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানগত যোগাযোগ। উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর মধ্যে ঐকমত্য বা সমঝোতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এ যোগাযোগ কাজ করে।

৩. উন্নয়ন যোগাযোগকারীর বৈশিষ্ট্য

নোরা সি কুইব্রাল উন্নয়ন যোগাযোগকারীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

* উন্নয়ন ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া যে পরিবেশে মিথস্ক্রিয়া করে তা তিনি বোঝেন;
* যোগাযোগ দক্ষতা ও কৌশলেই শুধু নয়, যে বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ;
* ন্যায়পরায়ণতার সহজাত মূল্যবোধ ও ব্যক্তির সম্ভাবনা উন্মোচনের বিষয় আত্মস্থ করেছেন;
* উন্নয়ন যোগাযোগের কয়েক ধরনের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা/জ্ঞান রয়েছে এবং
* মানব উন্নয়নের অগ্রগামিতার জন্য আলাদা দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়বদ্ধতার জ্ঞান আছে।

৪. উন্নয়ন যোগাযোগ পদক্ষেপসমূহ

উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রমকে জোরদার এবং অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় তা হলো অ্যাডভোকেসি (সমর্থন আদায়), সামাজিক সংঘবদ্ধকরণ (social mobilization), কর্মসূচি যোগাযোগ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন। (আজিজ, ১৯৯৮)।

৪.১ অ্যাডভোকেসি

ইউনিসেফ অ্যাডভোকেসিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: 'The continuous and adaptive process of gathering, organising and formulating information and data into argument, which is then communicated to policy-makers through various interpersonal and mass media communication channels.' সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূল হলে সেগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করা এবং জনগণকে সেসব কাজ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করাই হলো উন্নয়ন যোগাযোগ। যোগাযোগ কর্মসূচির প্রতি শর্তহীন সমর্থন নয়, বরং দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এ প্রক্রিয়ায়। গৃহীত বিষয়টির পরিচিতি ও সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অভিমত নেতা, শিক্ষক, পেশাজীবী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এবং দাতাগোষ্ঠীদের সংগঠিত এবং পরস্পর সহায়ক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়, যৌক্তিকতা এবং নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির কারণে যোগাযোগ কর্মসূচিতে গৃহীত অঙ্গীকার পালন সহজসাধ্য হয়, অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত ফলও।

৪.২ সামাজিক সংঘবদ্ধকরণ

উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পক্ষকে মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করার প্রক্রিয়া হলো সামাজিক সংঘবদ্ধকরণ। সামাজিক সংঘবদ্ধকরণের ফলে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। উন্নয়ন কর্মসূচি গতিশীল ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রচিত হয় সেতুবন্ধ।

৪.৩ কর্মসূচি যোগাযোগ

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রণয়ন, অনুষ্ঠান প্রযোজনা, উপকরণ নির্মাণ, যোগাযোগ ও শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী এবং উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপযোগী বার্তা, তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য পদ্ধতিগতভাবে প্রসার ও প্রচারের ব্যবস্থাই হচ্ছে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি যোগাযোগ। (আজিজ, ১৯৯৮)।

৪.৪ গবেষণা ও উন্নয়ন

উন্নয়ন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় গবেষণা ও উন্নয়ন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে বাস্তবায়িত সব কাজের প্রতিক্রিয়া, প্রভাব এবং প্রয়োগ সম্পর্কিত ফলাবর্তন (feedback) জানা

আবশ্যক। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও কৌশল পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক মানচিত্র একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ দেশের জনগোষ্ঠীর নানা বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য, সামাজিক আচার, রীতি, প্রথা, তথা জীবনপ্রবাহের নানা দিক বিবেচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশল, বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার ধরন ও কৌশল নির্ধারণ এবং নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাঠক-দর্শক-শ্রোতার চাহিদা, মানসিকতা, পরিবেশ, সময়, বিশ্বাস, বিষয়, অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্ত সম্পদ বিবেচনা করেই যোগাযোগকারী তথ্য সঞ্চালনের জন্য অভিযানের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে চাহিদাভিত্তিক, সুদূরপ্রসারী, অভীষ্ট লক্ষ্যসংবলিত, বাস্তবসম্মত, জনমত সৃষ্টিকারী, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমর্থন আদায়মূলক, উদ্ভাবনধর্মী এবং অংশীদারিত্বমূলক বিকিরণ প্রক্রিয়া। (আজিজ, ১৯৯৮)।

৫. উন্নয়ন যোগাযোগের পূর্বশর্ত

উন্নয়ন যোগাযোগ উদ্দেশ্যমূলক, লক্ষ্যাভিমুখী, নিরূপক ও বাস্তবিক। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা। এটা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার পরিপূর্ণ সক্ষমতার বিকাশ সাধনের যোগাযোগ প্রচেষ্টা। মূলত সামাজিক সচেতনতামূলক যোগাযোগই উন্নয়ন যোগাযোগ।

দুই ধরনের মনোভঙ্গি থেকে উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগকারী তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটান। আর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের জন্য কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক তথ্যের জন্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এ দুই মনোভঙ্গি উন্নয়ন যোগাযোগের কতগুলো পূর্বশর্তকে নির্দেশ করে। পূর্বশর্তগুলো হলো বিমূর্ত ও কেন্দ্রীকৃত যোগাযোগের পরিবর্তে মানবীয় ও স্থানিক যোগাযোগ, যোগাযোগ সংযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভূমিকা এবং এর প্রবেশযোগ্যতা।

উন্নয়ন যোগাযোগ প্রচেষ্টা চাহিদামাফিক, জনগণের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও উন্নয়ন অবস্থাকে বিবেচনার নির্দেশ করে মানবীয় ও স্থানিক মনোভঙ্গি। কারণ এ মনোভঙ্গি বিবেচনায় না নিলে শহর ও গ্রাম, ধনী ও দরিদ্র, নারী ও পুরুষের মধ্যে উন্নয়ন ফারাক যেমন আর্থসামাজিক, জ্ঞানগত এবং যোগাযোগ বৈষম্য অনুধাবন করা যাবে না। সমাজে এ ধরনের উন্নয়ন বৈষম্য বিরাজমান থাকলে জনগণের উন্নয়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করতে হবে।

যোগাযোগ মাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা উন্নয়ন যোগাযোগের আরেকটি পূর্বশর্ত। যোগাযোগ মাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা থাকলে উন্নয়ন বার্তায় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য গণমাধ্যম ও আন্তর্ব্যক্তিক মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। গণমাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা তিনটি উপ-বিষয় দ্বারা নির্ধারিত।

(ক) প্রযুক্তিগত, তাত্ত্বিক ও গণমাধ্যমের সম্ভাব্য নাগাল; (খ) জনগণের মধ্যে মাধ্যমের বিতরণ ও (গ) জনগোষ্ঠীর আন্তর্ব্যক্তিক পরিকাঠামো। উন্নয়ন যোগাযোগের জন্য যা আবশ্যক: তা হলো উন্নয়ন যোগাযোগ পাটাতন অর্থাৎ উন্নয়নের বস্তুগত সম্পদ ও উন্নয়ন সূচকের সুদৃঢ় অবস্থান।

৫.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগ পাটাতন

এরিস্টটল বলেছেন, 'Wealth is evidently not the good we are seeking; for it is merely useful and for the sake of something else. সুন্দর জীবনের জন্য সম্পদ প্রয়োজন, তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়। বিরাজমান সম্পদের সুষম বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করলে মানুষের অধিকারসমূহ অনেকটাই নিশ্চিত করা যায়। এ অবস্থায় উন্নয়নের পরিস্থতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিস্থিতি এখনো আশানুরূপ নয়। কেননা উন্নয়ন ধারার চরিত্র এমন যে, এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ে। বাৎসরিক যে জিডিপি বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়, এমনকি গড় হিসেবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিরও যেসব পরিসংখ্যান দেয়া হয়, তার আড়ালে থেকে যায় উদ্বেগজনক বাস্তবতা। কারণ এ প্রবৃদ্ধি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে স্পর্শ করতে পারছে না। সামগ্রিকভাবে সব জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করতে পারছে না বরং সৃষ্টি হচ্ছে শহরভিত্তিক কিছু সমৃদ্ধির বলয়।

কয়েক দশক ধরে উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়ন করার পরও বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। দেশটি এখনো উন্নয়নশীল দেশের তকমা লাগিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতীক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। সার্কভুক্ত দেশগুলো এবং বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশের মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়ের তুলনামূলক চিত্র থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিস্থিতি অনুধাবন করা যেতে পারে।

সারণি-১: বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় (২০১৪)

দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)	দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)
বাংলাদেশ	১,২৬৬	ফ্রান্স	৩৭,৭২৮
ভুটান	২,৮৩৭	জাপান	৩২,৪৮১
ভারত	**১,৬৮৮**	নরওয়ে	৯৭,৩৬৩
মালদ্বীপ	৮,৭১৪	সুইডেন	৫৮,৮৮৭
নেপাল	৭৫১	সুইজারল্যান্ড	৮৫,৩৭৪
পাকিস্তান	১,৩৩৩	যুক্তরাজ্য	৫৪,৩০৬
শ্রীলংকা	৩,৬৩৫	যুক্তরাষ্ট্র	৪৬,৪৬১

উৎস: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ

ওপরের সারণিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় শুধু নেপালের চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১,২৬৬ ডলার (যদিও মে ২০১৫ পর্যন্ত ১,৩১৪ ডলার হয়েছে) হলেও বাস্তবতা আরো ভিন্ন। মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণি এ আয় ভোগ করে। সুষম বণ্টন এবং বৈষম্যের কারণে উন্নয়ন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হচ্ছে না।

একথা স্বীকার্য যে, গ্রাম বাঁচলেই বাংলাদেশ বাঁচবে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'রাজনৈতিক মুক্তি কখনোই আসবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী একথা মনে করবে যে, তাদের পরিবর্তন তাদের চেষ্টার মাধ্যমেই আসতে হবে এবং তারা যা চায় সেভাবেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। (Chowdhury, 1978)। কিন্তু বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে শহর এবং গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবধান। কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য গ্রামগুলো পর্যাপ্ত বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত। যা কিছু গ্রামে বণ্টন করা হয়, তারও বেশির ভাগ ভোগ করে গ্রামীণ উচ্চবিত্তরা। এ কারণে গ্রামের মানুষ হয় বঞ্চিত। তাই গ্রামীণ সমাজেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। বাংলাদেশের প্রায় ৪০ ভাগ গ্রাম এখনো অনুন্নত। যেখানে পাকা রাস্তা বা বিদ্যুৎ সংযোগ কোনোটাই নেই। (বায়েস ও হোসেন, ২০০৮)। খানা জরিপে প্রমাণিত যে, গ্রামে বেশির ভাগ বাস করে গরিব ও প্রান্তিক জনগণ। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত জনগণের সংখ্যা খুবই কম। ৩৮ শতাংশ গ্রামীণ জনগণ খুবই গরিব। ভূমিহীন এসব জনগণের দৈনন্দিন আয় খুবই সীমিত। (BCAS, 2000)।

আয়, অর্থনৈতিক লেনদেন, বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে শহরে দারিদ্র্যের হার কমলেও গ্রামে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। যদিও পল্লী এলাকায় কিংবা দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ একেবারেই কম ছিল না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এর তাৎপর্যপূর্ণ অংশের বাস আবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। গ্রামে দরিদ্রের সংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি। দারিদ্র্যের হার গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে ৩৬ ও ২৮ শতাংশ। (IFAD, 2014)। এখনো গ্রামবাংলার প্রতি ১০০ থানার মধ্যে ছয়টিতে 'নীরব দুর্ভিক্ষাবস্থা' বিরাজ করছে। এক কোটি লোক প্রতিদিন জীবন সচল রাখার প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ বঞ্চিত। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ তাদের ধাওয়া করে প্রতিদিন এবং অকালমৃত্যুতে ঠেলে দেয়। (বায়েস ও হোসেন, ২০০৮)। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার ও এনজিওগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিবছর এক শতাংশ হারে দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

সার্বিকভাবে নারী-পুরুষে বৈষম্যও বিদ্যমান। নারীরা পুষ্টি, শিক্ষা, চাকরি সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। তবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলে নারী উন্নয়নের পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া গ্রামীণ এবং শহরে জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য রয়েছে। গ্রামীণ জনগণ যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই সন্তুষ্ট, সেখানে শহরের জনগণ জীবনের উচ্চ গুণগতমান অর্জনের পরও তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তথ্যের জন্য যেখানে একটি টিভি, একটি রেডিও বা একটি পত্রিকাই যথেষ্ট, সেখানে তারা একাধিক টিভি, রেডিও এবং পত্রিকা

রাখে। কারো কারো একাধিক গাড়ি ও বাড়ি। আর গ্রামীণ জনগণের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ নেই। বাংলাদেশে তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ও পার্থক্যের কারণে 'উন্নয়ন ফারাক' রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ৮৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ভূমির যথাযথ ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন। বাংলাদেশে খাদ্য ও জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমলেও এখনো প্রতিবছর প্রায় ২৫ লাখ নতুন মুখের খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হচ্ছে। দেশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে লোকজনের দ্রুত হারে স্থানান্তরের পরও কৃষি খামারের গড় আয়তন কমে যাচ্ছে (খান, ১৯৯৮)। প্রতিবছর ১৫-২০ লাখ লোক খাদ্য নিরাপত্তাহীন হচ্ছে শুধু কৃষি জমি অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য। (বায়েস ও হোসেন, ২০০৮)।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যথেষ্ট অবদান রাখছে। বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশ জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং ৫০ শতাংশ জমিতে উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্যের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। (খান, ১৯৯৮)। কিন্তু আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠছে। কারণ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যয়বহুল হওয়ায় সমাজের ধনীশ্রেণির কৃষকদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রান্তিক কৃষক বেশি মূল্যের কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ছেন। তাই কৃষি উৎপাদন বাড়লেও বৈষম্য কমছে না। আবার পর্যাপ্ত প্রযুক্তির অভাবে কৃষিক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। কৃষির উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ সমাজকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। জনগণের প্রকৃত চাহিদা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা না বুঝে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাকিস্তান আমলের ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চলছে। অংশগ্রহণমূলক এবং নিচ থেকে ঊর্ধ্বমুখী পরিকল্পনার পরিবর্তে আমলাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত ওপর থেকে নিম্নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় বাংলাদেশে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না। পরিকল্পনায় ফলাবর্তন পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে এটি ফলপ্রসূ হয় না। ফলে বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নও হচ্ছে না।

তবে আশার কথা এই যে, বাংলাদেশের জন্মলগ্নে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এদেশকে বলেছিলেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। কিন্তু বর্তমানে ওই অবস্থা নেই। এখন বলা হচ্ছে 'খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন ঝুড়ি'। উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এমনকি নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মা ও শিশুমৃত্যু এবং জন্মহার কমানো, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশুদের টিকাদান, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখ করেছেন। ভারতও এসব সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে। এসব ক্ষেত্রে বস্তুগত উন্নয়ন সম্পদের ভূমিকার চেয়ে উন্নয়ন যোগাযোগের অবদান অনেক বেশি। কেননা, এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণিক পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নয়নের আবহ তৈরি করেছে সরকারসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং গণমাধ্যম।

দেশের উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যবিমোচনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও এসেছে। তবে উন্নয়ন পরিকল্পনা অতিমাত্রায় দাতা নির্ভরশীল ও কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মানবিক এবং স্থানিক মনোভঙ্গি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই উন্নয়নের বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, উন্নয়ন যোগাযোগের প্রথম শর্তটি বাংলাদেশে সেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

৫.২ বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগ মাধ্যম

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন যোগাযোগ মাধ্যমের প্রয়োজন। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেল বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করছে। রেডিও-টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও, বইপুস্তক, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র, প্রচারপত্র (পোস্টার, ব্যানার), প্রদর্শনী, লোকজ সংগীত, নাটক ও পথনাটকসহ বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো কী ভূমিকা পালন করছে এবং কীভাবে করছে,তা নিচে আলোচনা করা হলো:

৫.২.১ সংবাদপত্র

সংবাদপত্র উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ডিএফপি'র হিসাব অনুযায়ী ৩১ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত দেশে নিবন্ধিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৬,৬১৬টি। বর্তমানে দেশে এক হাজারের বেশি অনলাইন সংবাদমাধ্যম। এ সংখ্যাগত হিসাবের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে। তবে তা লক্ষ্য স্থির করে নয়, অনেকটা সহজাতভাবেই। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোয় এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সংবাদ ছাপা হচ্ছে। এর মধ্যে উন্নয়ন সংবাদও থাকে। কিন্তু এসব উন্নয়ন সংবাদ সংবাদপত্রগুলো কীভাবে কভার করে এবং তা পাঠকের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয় বা পাঠককে অনুপ্রাণিত করছে, তা গবেষণার বিষয়। অন্যান্য সংবাদের তুলনায় উন্নয়ন সংবাদের অগ্রগণ্যতার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া উচিত। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিস্থিতি সংবাদপত্রে আরো স্থান পাওয়া উচিত। অথচ বাংলাদেশের উন্নয়ন সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সংবাদপত্রে এটি মুখ্য হয়ে উঠেনি। (আলী ও পারভীন, সালবিহীন)। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কেন্দ্র ও প্রান্তের ভারসাম্যহীনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান হলেও মফস্বলের সংবাদ দীর্ঘকাল থেকে অবহেলিত। মফস্বলের সংবাদগুলো গুরুত্ব সহকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। গ্রামের উন্নয়ন সংবাদ সংবাদপত্রে ভালো কভারেজও পায় না। ফলে জনগণের মধ্যে উন্নয়ন সচেতনতা গড়ে উঠছে না। তবে সমস্যা জর্জরিত গ্রামীণ সমাজের প্রতিচিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলো বড় ভূমিকা পালন করছে; কিন্তু গ্রামে শিক্ষার হারের স্বল্পতা ও এসব সংবাদপত্রের পাঠক কম হওয়ায় প্রকাশিত উন্নয়ন বার্তা কার্যকর হচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু আজও প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন ধারায় গ্রামমুখিতা গড়ে ওঠেনি। ফলে ষাট বা সত্তরের দশকের তুলনায় সংবাদপত্রে গ্রামের সংবাদ বেশি ছাপা হলেও দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের সমস্যা, জটিলতা বা গভীরতা যথার্থভাবে অধিকাংশ পত্রিকায় প্রতিফলিত হয় না। (আলী ও পারভীন, সালবিহীন)। উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের অনেক ঘটনা যা স্ট্রেইট জ্যাকেট সংবাদ হিসেবে আসতে পারত তা আসে না এবং এলেও এসব সংবাদ ব্যাখ্যা করা হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা যা ষাটের দশকে পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন সাংবাদিকতার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে যা নিয়ে অনেক আলোচনা-তর্কবিতর্ক হয়েছে, তা এখনো বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় প্রকৃত অর্থে স্থান লাভ করেনি। (আলী ও পারভীন, সালবিহীন)। আশার কথা হচ্ছে, যারা উন্নয়নে অবদান রাখছে, তাদের সাফল্যের কাহিনী গুরুত্বসহকারে তুলে ধরছে কিছু জাতীয় দৈনিক। এসব সাফল্যের কাহিনী অনুপ্রাণিত করছে জনগণকে। সংবাদপত্রগুলো বর্তমানে মফস্বলের উন্নয়ন ও সমস্যাবিষয়ক সংবাদকেও গুরুত্ব দিচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষায় সংবাদপত্র একটা ইতিবাচক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯ শতকের শেষের দিকে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা ও আশেপাশের নদী রক্ষায় এবং রাজধানীকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টার, বুয়েট ও বাংলাদেশ স্কাউট যৌথভাবে 'আরবান এজেন্ডা' কর্মসূচি গ্রহণ করে। (Anam, 2002)। এ উদ্যোগের অধীনে স্কাউট সদস্যসহ নগরবাসী শহরের পরিচ্ছন্নতায় বিভিন্ন র‍্যালি, ওয়ার্কশপ আয়োজন করাসহ সরাসরি রাজধানীর ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করত। ফলে সিটি করপোরেশন ময়লা-আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (Anam, 2002)। মুদ্রণ মাধ্যমই আর্সেনিকের ভয়াবহতা নিয়ে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৫.২.২ রেডিও

রেডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেডিও'র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রেডিও'র ভূমিকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশে নগরায়ণ অত্যন্ত সীমিত এবং শিক্ষার হার খুব কম। ফলে যে কোনো ধারণা প্রচারে রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (ইসলাম, ১৯৯৮)।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ বেতারসহ দেশে ১২টি বেসরকারি রেডিও চ্যানেল (এফএমসহ) ও ১৫টি কমিউনিটি রেডিও রয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেশে কমিউনিটি রেডিও'র আবির্ভাব উন্নয়ন অভিযাত্রার অংশ হিসেবে খুবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন যোগাযোগ অর্থাৎ উন্নয়নে স্থানীয় ও কমিউনিটি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি রেডিওগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সার্বিক পরিকল্পনা, আধেয় নির্মাণ ও তা

প্রচারে জনগণের অংশগ্রহণ ভালোভাবে না থাকায় উন্নয়ন বার্তা কার্যকর হচ্ছে না। অন্য বেসরকারি রেডিওগুলো মূলত বিনোদননির্ভর। উন্নয়ন বার্তা সেখানে অনুপস্থিত বললেই চলে।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলেও উন্নয়ন যোগাযোগে এর অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ইতিবাচক পরিবর্তন। বাংলাদেশ বেতার ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৬০ সাল থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রচার চালিয়ে আসছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সহায়তায় সওরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ বেতারে জনসংখ্যা সেল খোলা হয়। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা ও এইচআইভি/এইড্‌স– এসব বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা ও অন্য ১১টি উপকেন্দ্র) প্রতিদিন প্রায় ৩৬০ মিনিট প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। জনসংখ্যা সেল যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, সরাসরি অনুষ্ঠান ফোন ইন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক গান, ডকুমেন্টরি, ছোটগল্প ও জিঙ্গেল অন্যতম। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হলো– পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি। আর এ ব্যবহার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যাবিষয়ক অনুষ্ঠানের আধেয় ও দর্শক বিশ্লেষণ শীর্ষক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপলব্ধির পেছনে বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে ২৪ শতাংশ নারী এবং ২৬.৩৭ শতাংশ পুরুষ উত্তরদাতা জানিয়েছেন। (ইসলাম, ১৯৯৮)।

তাছাড়া বাংলাদেশ বেতার নামে ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন তিনটি কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করে। পাঁচ মিনিট স্থিতিসম্পন্ন তথ্যমূলক কৃষি সমাচার নামে প্রথম অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় সকাল টা ২৫ মিনিটে। দিনের শুরুতেই কৃষকদের কী কী করণীয়, তা অনুষ্ঠানে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা হয়। 'সোনালি ফসল', 'দেশ আমার মাটি আমার' প্রভৃতি কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় বেতারে।

সারণি-২ : রেডিও'তে প্রচারিত কৃষি ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি

সময়	অনুষ্ঠানের নাম	অনুষ্ঠানের ধরন
সকাল ৬.২৫ মিনিট	কৃষি সমাচার	কৃষিবিষয়ক আলোচনা
সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৩৫ মিনিট	সোনালি ফসল	আলোচনা, গ্রামীণ বধূ, চিঠির উত্তর, জীবন্তিকা, ম্যাগাজিন
সন্ধ্যা ৭.০৫-৭.৩০ মিনিট	দেশ আমার মাটি আমার	আলোচনা, গৃহিণী, মাঠপর্যায়ের সাক্ষাৎকার, চিঠির উত্তর, জীবন্তিকা, কুইজ, গান, সেতুবন্ধ, স্বাস্থ্য জীবন
প্রতি শুক্রবার রাত ৮.০৫-৮.২০ মিনিট	যৌন জীবন	যৌন স্বাস্থ্য
রাত ১০-১০.২২ মিনিট	এসো গড়ি সুখের ঘর	পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক

উৎস: www.betar.gov.bd

এছাড়া বাংলাদেশ বেতারে উন্নয়ন সম্পর্কিত যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেগুলো হলো:

উদ্দীপনামূলক : স্বনির্ভরতা অর্জন, সঞ্চয়, জনশক্তি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা ও শিল্প প্রভৃতি।

পুনর্গঠনমূলক : রাস্তাঘাট ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নয়ন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমি সংস্কার, বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, কৃষিঋণ, নৈতিক অবক্ষয় থেকে সমাজের পুনর্গঠন প্রভৃতি।

তথ্যমূলক : শিক্ষা, খেলাধুলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি।

বিনোদনমূলক : নাটক, জীবন্তিকা, গল্প, গান প্রভৃতি।

বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ রেডিও বেশি ব্যবহার করে। এসব জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণে একটা আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এ মাধ্যমটি। বাংলাদেশ বেতার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালনে পুরোপুরি সফল– এ কথা বলা যায় না। তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এ গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে– এ কথা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিভিন্ন মাধ্যমের আবির্ভাবে বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতা ক্রমশ কমে যাওয়ায় এ মাধ্যম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে– এ কথা বলা যায় না।

৫.২.৩ টেলিভিশন

বাংলাদেশ উন্নয়ন অভিমুখী দেশ। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান আমলে ওই সরকারের গুণকীর্তন করলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকালে কলাকুশলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। তবে স্বাধীনতার পর উন্নয়নধর্মী অনুষ্ঠানমালায় বিটিভিকে সাজানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের একপর্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে হোঁচট খায় বিটিভি। গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জিয়া সরকার গ্রামীণ টেলিভিশন প্রদর্শন কেন্দ্র চালু করলেও দেশে বিরাজমান অন্যান্য অবকাঠামোর কথা বিবেচনায় না আনায় এই সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালে রঙিন টেলিভিশনের সূচনায় দেশে কী লাভ হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারে না। (লিপন, সালহীন)।

গঠনমূলক সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করা এ গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য। তথ্য পরিবেশন, শিক্ষা প্রসার, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও নির্মল আনন্দদান বিটিভি'র অনুষ্ঠান প্রচারের মূল লক্ষ্য। বিটিভি উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান কতটুকু প্রচার করে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩ : বিটিভির অনুষ্ঠান বিভাজন

অনুষ্ঠানের ধরন	শতকরা
সংবাদ	২০%
উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক	৩০
সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক	৩৫
অন্যান্য	১৫
মোট	১০০

উৎস: বিটিভি

ওপরের সারণিতে দেখা যায়, সরাসরি উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের শতকরা হার ৩০ শতাংশ। তাছাড়া ২০ শতাংশ সংবাদ, ৩৫ শতাংশ সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক এবং ১৫ শতাংশ অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হয়ে থাকে। উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সব অনুষ্ঠানের ৭৮ শতাংশই কৃষি, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, শিশু ও নারী এবং মানবাধিকারের মতো বিষয় নিয়ে প্রচারিত হয়। (BTV, 2015)।

দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়ন চাহিদা এবং জীবনের সার্বিক কর্মধারা, শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশবিষয়ক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত অনুষ্ঠান এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ নিয়মিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সহায়তায় আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে জনসংখ্যা সেল খোলা হয়। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা ও এইচআইভি/এইড্‌স– এসব বিষয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন পঁচিশ মিনিটের নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করে তার মধ্যে সিনেমা, টিভি-স্পট, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টকশো, নাটক, ধারাবাহিক নাটক, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও মিউজিক ভিডিও অন্যতম।

তাই বলা যায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশনের

কাজ হচ্ছে, জনগণের আচরণ পরিবর্তন করে সমাজের অসংগতি, ভুলভ্রান্তি ও অসত্য দূর করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা– বিটিভি এক্ষেত্রে খুব বেশি সফল হয়েছে তা বলা যায় না। বিটিভি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ও সেকেলে পদ্ধতির মাধ্যম হওয়ায় এর সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের কাছে খুব কম। সংবাদের প্রতি অবিশ্বাস মূলত পুরো বিটিভি নামক গণমাধ্যমটির ওপর গিয়ে পড়ে। 'Bangladesh Betar and BTV both strongly reflect the views of the government of the day. Their programming is widely regarded as dull and uninspired compared with that of their private sector competitors, (As cited in InfoAsia, 2012). এমআরবি বাংলাদেশের দর্শক জরিপ অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামের দর্শকরা যতক্ষণ টিভি দেখেন তার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ সময় তাদের চোখ থাকে বিদেশি চ্যানেলগুলোর ওপর। বাকি ৩০ শতাংশ সময় স্থানীয় চ্যানেলগুলোর সঙ্গে থাকে। এই দর্শক গড়ে এক শতাংশের কিছু বেশি বা কম সময় দিচ্ছে বিটিভি দেখার জন্য। ২০১০ সালে এই হার ছিল ২.৪৬ শতাংশ। (প্রথম আলো, ২০১৬)। উন্নয়নমূলক সংবাদ ও বার্তা প্রচার হলেই হবে না, কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে সবার নাগালে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু বিটিভি অনুষ্ঠান বেশির ভাগ জনগণ না দেখায় এর প্রভাব বেশি পড়ছে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এক জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কান্ট্রি রিপোর্ট অন হিউম্যান রাইটস প্র্যাকটিসেস-২০১৪' বলে, 'বাংলাদেশে প্রায় ৮০ শতাংশ নাগরিক টেলিভিশন থেকে তথ্য পায়। তবে ৬০ শতাংশ জনগণ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দেখার সুযোগ পায় না।' উন্নয়ন সংবাদ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়ন বার্তা প্রচারে তেমন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে না বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো। বেশির ভাগই সংবাদ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সংবাদ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলো উন্নয়ন আবহ তৈরির উদ্দেশ্যে নির্মিতও নয়। তবে চ্যানেল আইয়ের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানটি উন্নয়ন বার্তা বিশেষ করে কৃষি বার্তা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। প্রথমত, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হতে হলে গণমাধ্যম উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে অবশ্যই থাকতে হবে। আর ব্যাপকভাবে গণমাধ্যম জনসাধারণের কাছে পৌঁছার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ প্রয়োজন। যেমন- পর্যাপ্ত সম্পদ, প্রযুক্তির সহজপ্রাপ্যতা, উচ্চবিত্ত মানুষের সংখ্যাধিক্য এবং শিক্ষার হার। বাংলাদেশে প্রায় ৫৬ শতাংশ লোকই অশিক্ষিত। যে ৪৪ শতাংশ লোক শিক্ষিত, তাদের অনেকে আবার গণমাধ্যমের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। সম্পদ এবং প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা তো রয়েছেই। তাছাড়া বাংলাদেশে উচ্চবিত্ত জনগণ শহরে অবস্থান করে। গ্রামে তাদের সংখ্যা খুবই কম। গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা বাংলাদেশে এখনো অনুপস্থিত।

৫.২.৪ দেশজ মাধ্যম

আগে উন্নয়ন যোগাযোগ ছিল একমুখী ও গণমাধ্যমনির্ভর। সত্তরের দশকে এসে উন্নয়ন ধারণার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে মাধ্যমের এবং উন্নয়ন যোগাযোগের ভূমিকার। এ সময় বিদেশি প্রযুক্তিনির্ভর গণযোগাযোগের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং উন্নয়নে দেশজ মাধ্যমের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ এ দেশের দশ ভাগের প্রায় নয় ভাগ জনগণ গ্রামে বাস করে। তাদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ অশিক্ষিত ও পাঁচ ভাগের চার ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাছাড়া বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও রয়েছে। বাংলাদেশে একেক অঞ্চলে একেক লোকজ সাংস্কৃতিক মাধ্যম বেশি জনপ্রিয়। (আল-মামুন, ১৯৯৮)। যাত্রা, পথনাটক, পুঁথিপাঠ, কবিতা, সাপ খেলা, ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল, গজল, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, পুতুলনাচ, লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, মানসী, গম্ভীরা, বারোশ সংগীত, বাউলগান, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি, লালন, আদিবাসী সংগীত, জারি-সারি, কবিগান, গল্পকথন ও যাত্রা প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দেশজ মাধ্যম।

পথনাটক যোগাযোগ মাধ্যমটি মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর উদ্যোক্তা রাজনৈতিক কর্মীরা হলেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এ মাধ্যমটির ব্যবহার প্রচুর সম্ভাবনাময়। প্রশিকা, আশাসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তাদের যোগাযোগ হাতিয়ার হিসেবে এরই মধ্যে এ মাধ্যমটির ব্যবহার করেছে। (আল-মামুন, ১৯৯৮)। গম্ভীরা চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকজ মাধ্যম হলেও এর আবেদন এখন রাজশাহী ও নাটোর জেলাসহ দেশব্যাপী। বিটিভি গম্ভীরা গানকে দেশব্যাপী জনপ্রিয় করেছে। পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন বার্তা প্রচারে গম্ভীরা গান সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। তাছাড়া অন্যান্য লোকজ মাধ্যমও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫.২.৫ আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ চ্যানেল

বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য দু'ধরনের আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেলের উপস্থিতি রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)। ব্যক্তিগত যোগাযোগ চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং অভিমত নেতা। এছাড়া কোনো কোনো অঞ্চলে জাতিগত ও সংগঠনের নেতারা উন্নয়নের তথ্যপ্রবাহে ভূমিকা পালন করে। নৈর্ব্যক্তিক যোগাযোগ চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে সরকারি সম্প্রসারণকর্মী এবং বেসরকারি উন্নয়নকর্মীরা। এসব আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেল উন্নয়নকে কতটুকু এগিয়ে নিচ্ছে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশে অর্ধেকেরও বেশি জনগণ যেখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং গ্রামে যেহেতু বিদ্যুৎ এখনো সব এলাকায় নেই, তাই এদেশের সব জনগণের কাছে গণমাধ্যম পৌঁছানো সম্ভব নয়। সব ব্যক্তির কাছে গণমাধ্যম পৌঁছানো সম্ভব না হলেও সবার কাছে উন্নয়ন বার্তা পৌঁছানো সম্ভব বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন তথ্যপ্রবাহের জন্য এ ধরনের প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। গণমাধ্যম যেহেতু সব জনগণের কাছে পৌঁছায়নি, সেহেতু আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেলগুলো উন্নয়নে এক ধরনের ভূমিকা পালন করছে, তা বলা যায়।

৫.২.৫.১ সরকারি সংস্থাগুলো

উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন সংস্থা আন্তর্ব্যক্তিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। এ নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তথ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্ব্যক্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার বার্তা, দক্ষতা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধাগুলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এসব বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছায়। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে হাজার হাজার সরকারি সম্প্রসারণকর্মী, যারা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং সরকারের সঙ্গে আন্তর্ব্যক্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। উন্নয়ন তথ্যপ্রবাহের জন্য এদের কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নমূলক অভিযাত্রায় দেখা গেছে, যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেই অনেকখানি কাজ করে ফেলা যায় না। সেজন্য কর্মীদেরও কাজে লাগাতে হয়। (শ্র্যাম, ১৯৯৩)।

সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা (বার্ড) ষাটের দশক থেকে উন্নয়ন যোগাযোগের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা করছে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বার্ড উদ্ভাবিত 'কুমিল্লা মডেল' বেশ প্রশংসিত। বিশেষ করে কৃষির উদ্ভাবন প্রসারণের ক্ষেত্রে বার্ডের গবেষণার ফলে উদ্ভাবিত 'মডেল কৃষক' এর ধারণা কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এভারেট এম রজার্স বার্ড উদ্ভাবিত এ মডেলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া গণমাধ্যমকে উন্নয়নে সার্থকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বার্ডের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়েছে। (Kabir, 1994)। 'মডেল কৃষক' এর মতো বিভিন্ন ইস্যুতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বার্ড গ্রামে সম্প্রসারণ এজেন্ট তৈরি করে। এসব কৃষক গ্রামীণ জনগণের মধ্যে যোগাযোগকারী হিসেবে উন্নয়ন বার্তা আদান-প্রদান করেন। বার্ড শুরু থেকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে এমন কিছু স্থায়ী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়, যাতে জনগণ কারও সাহায্য ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে। তাছাড়া বার্ডের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আন্তর্ব্যক্তিক মাধ্যম এবং গণমাধ্যম একই সাথে ব্যবহার করা। বাংলাদেশে বেশকিছু এনজিও বার্ডের এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। উন্নয়ন যোগাযোগের অংশ হিসেবে বার্ড গল্পকথন, জারিগানসহ লোকজ সংগীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যম (যেমন– পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট, সাময়িকী), সভা-

সমাবেশ, প্রদর্শনী, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড প্রভৃতি মাধ্যমও ব্যবহার করে। (Paul, 2010)।

উন্নয়ন যোগাযোগ বিষয়ে বাংলাদেশে গবেষণা করেছে এবং মাঠপর্যায়ে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এমন দুটি প্রতিষ্ঠানের কিছু অভিজ্ঞতা মো. সফিকুল ইসলাম তাঁর 'উন্নয়ন যোগাযোগ: সাম্প্রতিক ভাবনা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, ঢাকাসহ জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি 'জিজ্ঞাসার' কথা উল্লেখ করা যায়। দেশের আটটি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রচলিত সরকারি কাঠামোর একজন পরিবারকল্যাণ মাঠকর্মীর দায়িত্বের মধ্যে ছিল ৫০০ থেকে ৬০০ সক্ষম দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা, এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা, ছোট পরিবারের সুফল তুলে ধরা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী পৌঁছানো। প্রতি কর্মদিবসে গড়ে তাকে ২০টি সক্ষম দম্পতির বাড়ি পরিদর্শন করতে হতো। যাতায়াত সমস্যার কারণে প্রতিদিন ২০ জন দম্পতির বাড়ি পরিদর্শন করা একজন মাঠকর্মীর পক্ষে সম্ভব হতো না। ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বাস্তবে বৃদ্ধি পেত না। এ পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে জিজ্ঞাসা কর্মসূচি সরকারি কাঠামো ঠিক রেখে প্রত্যেক মাঠকর্মীর আওতাধীন সক্ষম দম্পতিদের বাড়ি যাতায়াতের নৈকট্য ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে ২০ থেকে ২৫টি জিজ্ঞাসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি জিজ্ঞাসা কেন্দ্রে একজন লিংকপারসন নিয়োগ করা হয় এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরিবারকল্যাণ মাঠকর্মী প্রতিদিন একটি পূর্বনির্ধারিত দিন ও সময়ে ওই লিংকপারসনের বাড়িতে এবং সদস্যদের বাড়িতে তিনটি সভায় মিলিত হতেন। এসব সভায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা, পূর্বধারণকৃত অডিও ক্যাসেট শ্রবণ ও আলোচনা এবং লোকগীতির আয়োজন করা হতো। যে ক'টি বাড়ি নিয়ে কেন্দ্র গঠিত, সেসব বাড়ির সক্ষম দম্পতিরা সভায় অংশগ্রহণ করতেন। তাছাড়া অবিবাহিত ছেলেমেয়েরাও এ সভায় যেত। যেসব সক্ষম দম্পতি সভায় যোগ দেয়নি, সভা শেষে মাঠকর্মী তাঁদের বাড়ি যেতেন যেন তারা পরবর্তী সভায় যোগ দেয়। তাছাড়া লিংকপারসনদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী মজুদ থাকত। যে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনে এগুলো সংগ্রহ করতে পারতেন। একই সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও'র মাধ্যমে নাটক, খণ্ড নাটক, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ সম্পর্কিত বার্তা প্রচার করা হতো। সক্ষম দম্পতিদেরও এসব অনুষ্ঠান দেখার ও শোনার জন্য উৎসাহ দেয়া হতো।

জিজ্ঞাসা কর্মসূচির ভালো দিক হলো– মাঠকর্মীকে বাড়ি বাড়ি যেতে হতো কম। এক জায়গায় সবাইকে পাওয়া যেত। ফলে কম সময়ে অধিক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো। দলীয় আলোচনার ফলে একজনের দেখাদেখি অন্য ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হতো। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সহজলভ্য ছিল এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামাজিকভাবে গৃহীত হতো। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য বলে সফিকুল ইসলাম তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

নারী ও শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগ কার্যক্রমে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি, যা স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সেবা সংক্রান্ত তথ্য, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বহুমুখী এক কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী পরিচালিত হয়েছে। সামাজিক প্রচার এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বহুমাত্রিক ও বাস্তবধর্মী পাঁচ বছর মেয়াদি এ কর্মসূচি ১৯৯৮ সালে শুরু হয়। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ছয়টি অধিদফতর/প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পের প্রধান সহযোগী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করে। (আজিজ, ১৯৯৮)।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য জানার অধিকার রয়েছে পরিবারের সবার। এটা এ যোগাযোগ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন: 'স্বাস্থ্য তথ্য' (Facts for life) ও 'মীনা উদ্যোগ'। 'স্বাস্থ্য তথ্য' একটি উন্নয়ন সমর্থিত যোগাযোগ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে জীবন ও স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত জনগণের সাথে বিনিময় করা হতো যাতে তারা উন্নত জীবনের লক্ষ্যে এসব অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। 'মীনা উদ্যোগ' হচ্ছে কার্টুনের সাহায্যে মেয়ে শিশুর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, যাতে মেয়ে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অপরদিকে লিঙ্গবৈষম্য দূর হয়। তবে এ ধরনের ব্যাপক যোগাযোগ কার্যক্রমের সফলতা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলে। (ফেরদৌস, সম্পাদিত, ২০০৫)।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারাদেশে জনসাধারণকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশু ও নারী শিক্ষা, টিকাদান কর্মসূচি, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, শিশু ও নারী অধিকার, স্যানিটেশন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ, নিরাপদ মাতৃত্ব, আত্ম ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে। ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, লোকসংগীতানুষ্ঠান, সেমিনার, নারী সমাবেশ, কমিউনিটি সভা, আলোচনা সভা, শিশু-কিশোর ও নারী মেলা, কথামালা প্রচার (মাইকিং), খণ্ড সমাবেশ, শব্দযন্ত্র স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়ন বার্তা প্রচার করে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করে এসব প্রচার চালানো হয় না বা এসব বার্তার কার্যকারিতা পরিমাপে কোনো গবেষণা বা প্রভাব নিরূপণও করা হয় না।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এখন ২৪ ঘণ্টা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি) কর্মরত চিকিৎসকদের নির্ধারিত মোবাইল ফোনে কল করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন সাধারণ জনগণ। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের রোগীরা বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে এ সেবা চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশের ২২টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেও টেলিমেডিসিন সেবা দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বসে চিকিৎসকরা বিনামূল্যে প্রতি কর্মদিবসে টেলিমেডিসিন সেবা দিচ্ছেন। কিন্তু বেশির ভাগ জনগণ এসব সেবা সম্পর্কে জানে না। স্বাস্থ্যবার্তা প্রদানের সবচেয়ে সহজ ও আধুনিক পদ্ধতি সচল থকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

চার দশক ধরে চলমান পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট পরিচালিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি বিষয়ে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এ দেশে সফল হয়েছে বলে দাবি করে সরকারি এ সংস্থাটি। যোগাযোগ কার্যক্রমের ফলে জন্ম নিরোধক ব্যবহারের হার ও ছোট পরিবার গঠনের প্রতি জনগণের ঝোঁক বেড়েছে। মোট প্রজনন হার, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা কমেছে। তাছাড়া নিরাপদ মাতৃত্ব, শুধু মাতৃদুগ্ধ পান, নবজাতকের যত্ন, বয়ঃসন্ধিকালীন যত্ন, লিঙ্গ সমতা, টিকাদান প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

পরিবারকল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকাদের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক বার্তা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আইইএম ইউনিট উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মননশীলতার উন্মেষ, দক্ষতা উন্নয়ন ও লজিস্টিক সহায়তা, যোগাযোগ উপকরণ তৈরি, বিতরণ ও প্রদর্শন– এসব কার্যক্রম পরিদর্শন, মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও জরিপ করে থাকে। স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি, বিলম্বে বিবাহ, নবজাতকের যত্ন, মায়ের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচার, নববিবাহিত ও কম সন্তান জন্মদানকারীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, বিবাহ নিবন্ধন, ধর্মীয় নেতা, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে সভা এবং আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালাও আয়োজন করে এ ইউনিট। পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, ব্রোশিউর ও ফ্লিপচার্টে সব উপাদান তৈরি ও বিতরণ এবং বিলবোর্ড ও হোল্ডিং প্রদর্শন করেও বার্তা প্রচার করে।

দেশকে ২৬টি অঞ্চলে বিভক্ত করে অডিও-ভিজ্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে, বস্তি ও দুর্গম এলাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে আইইএম ইউনিট। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টরি সিনেমা, টিভি নাটক, টিভি-স্পট, টিভি ম্যাগাজিন ও পথনাটক তৈরি, সম্প্রচার ও প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং এফএম রেডিওর মাধ্যমে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গণযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে এ ইউনিট। লোকগান, জারিগান, যাত্রা, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা– এসবের মাধ্যমে বার্তা প্রচার করে। স্থানীয় শিল্পী/কলাকুশলীদের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় সাতটি বিভাগীয় শহরে গানের আসর আয়োজন করে।

কৃষি মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে কৃষি উন্নয়নের জন্য বস্তুগত পদক্ষেপের সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। কৃষিবিষয়ক গবেষণা ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয় আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে। পলিথিন ব্যবহার রোধে সরকার তার সম্প্রসারণকর্মীর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রক্রিয়া চালায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পায়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য

সার্ভিস ১৯৬১ সাল থেকে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য এবং এ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বার্তা প্রচার করে কৃষি উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার ছাড়াও বই, নিজস্ব পত্রিকা, বুলেটিন, বুকলেট, জার্নাল, প্রতিবেদন, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, ফ্লিপচার্ট, স্টিকার, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষিতথ্য প্রচার করে থাকে। কৃষিতথ্য সার্ভিস এ পর্যন্ত শতাধিক স্পট, ফিলার, ফিল্মসহ বিভিন্ন কৃষিতথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ভিডিওসামগ্রী তৈরি করেছে। দেশের ১০টি অঞ্চলে মোবাইল 'সিনেমা ভ্যানের' মাধ্যমে এসব প্রদর্শন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কৃষি বিনোদনভিত্তিক ডকুমেন্টরি– ডক্যুসং, ডকুড্রামা, পট্ গান, স্পট গান ও গম্ভীরাসহ অন্যান্য লোকজ মাধ্যমে কৃষিতথ্য প্রচারিত হচ্ছে। (কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৫)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির জনগণকে সম্পৃক্ত করতে গণমাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করছে। ফলে সচেতন অভিভাবক কর্তৃক সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সচেতনতা বাড়াতে ১৯৯৯ সালে এ বিভাগ যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে।

কৃষিতথ্য সার্ভিস ৪ জুন ২০১৪ থেকে মোবাইল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি কল সেন্টার চালু করেছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে ১৬১২৩ ডিজিটে ফোন করে কৃষক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন। এছাড়া একটি উপজেলায় 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এসব বার্তা কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে, তা গবেষণা করা হচ্ছে না। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কৃষি বার্তা তৈরি ও কৃষিতথ্য চাহিদা পূরণে কৃষকের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হচ্ছে না। নির্দিষ্ট যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন না করেই 'যোগাযোগ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে কৃষি তথ্য সার্ভিস।

৫.২.৫.২ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়ে যেসব উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে বর্তমানে এমন কোনো দুর্গম অঞ্চল পাওয়া যাবে না যেখানে এনজিওদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। এ সংস্থাগুলো জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কাজ করে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ছোট ছোট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এর মধ্যে ২ হাজার ২৪৩টি এনজিও (জুন ২০১৪ পর্যন্ত) শুধু সরকারের এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে। তবে এর মধ্যে অনেক এনজিও'র শুধু রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, কোনো কার্যক্রম নেই।

স্থানীয়ভাবে কর্মরত এসব এনজিওর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক তথ্য, অভিজ্ঞতা বিনিময়, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্থানীয় ও নিজস্ব সম্পদ যৌথভাবে কাজে লাগানো প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্ক। বিশেষ করে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কাজের প্রতি রূপায়ণ বা পুনরাবৃত্তি এবং কর্ম এলাকার অধিক্রমণ (overlapping) সংক্রান্ত জটিলতা ও তিক্ততা এড়ানোর একটি কার্যকর ফোরাম হিসেবে এসব স্থানীয় আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। দাতাগোষ্ঠী, সরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও বৃহৎ এনজিওদের নানা প্রকল্প এসব স্থানীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- গণশিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বনায়নসহ আরও অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এনজিওসমূহ কাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার হিসেবে এসব বেসরকারি সংস্থা কোনো এলাকার বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে স্থাপন করছে বিদ্যুতায়ন প্রকল্প, দূষিত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শোধনাগার, আবর্জনা পরিশোধন প্রকল্প, কীটপতঙ্গ মারার সমন্বিত বালাইনাশক পদ্ধতি, প্রচলিত রীতির পরিবর্তে উন্নততর পদ্ধতির উপস্থাপন। এগুলো দৃশ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন হিসেবে মনে হলেও উন্নয়ন যোগাযোগ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি, সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশগ্রহণমুখিতা, তথ্যপ্রবাহ সমন্বয় ও যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রয়োগ করে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় এনজিওগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার এবং চালিকাশক্তিরূপে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। ক্রমশ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর (গ্রামীণ দরিদ্র) দ্বারপ্রান্তে উন্নয়নের সুফল যথাযথ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে দ্রুত পৌঁছে দেয় এসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

দেশের অসংখ্যা ছোট এনজিও এখন বড় এনজিও'র মূল সহায়ক শক্তি। আবার জাতীয়-আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত এসব স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্ককে নানামুখী উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন আদায়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এনজিওগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে তথ্যের আদান-প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের সাথে জনগণের সম্পৃক্তকরণ উন্নয়ন কর্মসূচিকে গতিশীল করছে।

বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সেই প্রাচীনকাল থেকে ভূমিকা পালন করছে। ওই সময় থেকেই পরিবারকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা এদেশের মানুষের সাথে জড়িত। গ্রামে প্রতিটি পরিবারের কিছু সাধারণ সম্পত্তি রয়েছে। যেমন- পুকুর, কৃষি জমি, বাগান ইত্যাদি। এসব সম্পত্তি বেশির ভাগ দেখাশোনা ও ভোগ করা হয় যৌথভাবে। এমনকি এসব সম্পত্তি/সম্পদকে উপযুক্ত কাজে লাগানোর জন্য উন্নয়ন বার্তা পারিবারিকভাবে গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরিবারের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উন্নয়ন প্রচেষ্টায়।

এটা ঠিক যে, প্রাপ্ত উন্নয়ন তথ্যকে সঠিক সময়ে সব পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে এর ব্যবহার ও কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। বর্তমানে আর্থসামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এবং তথ্যসেবা ও গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন এনজিও কাজ করছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিভিন্ন গবেষণা ও উদ্ভাবন করে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে এবং তা কাজে লাগানোর জন্য দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এসব সংস্থার লক্ষ লক্ষ মাঠকর্মী প্রতিনিয়ত উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে এবং উদ্বুদ্ধ করছে। কিন্তু উন্নয়ন বার্তা তৈরি ও প্রচার প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলো সত্যিকার অর্থে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা বলা হলেও তা কাগজে-কলমেই অনুসরণ করা হয়, সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। এক গবেষণায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একটি এনজিওর স্বাস্থ্য বার্তা তৈরিতে এ সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায়। (Haque, 2015)।

বাংলাদেশে কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ বিন্যাস করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি। এসব বিষয় এবং ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র যোগাযোগ কার্যক্রমের পরিধি, বিভিন্ন গণযোগাযোগ মাধ্যম ও আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ পদ্ধতি সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যম, উপকরণ, সম্প্রসারণকর্মীদের সাহায্যে প্রকল্পের বার্তা ও তথ্য সঞ্চালন করা হয়। বেতার, টিভি ও গণযোগাযোগ কর্মকর্তারা বিভিন্ন যোগাযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন উন্নয়নবিষয়ক বার্তাপ্রবাহকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

জ্ঞানচর্চাকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উন্নয়নবিষয়ক প্রচুর গবেষণা হয়। অনেক বেসরকারি সংস্থা প্রকল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ্ধতিগত মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব ছাড়াও মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, বন গবেষণাগার, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, আইএলও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিডো, ইউনেস্কো বহু প্রতিবেদন তৈরি এবং উন্নয়ন গবেষণায় সহায়তা করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) বিভিন্ন উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা করে। এসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা উন্নয়ন যোগাযোগ সম্পর্কিত নয়। তাছাড়া এসব গবেষণার সুপারিশ/ফলাফল কাজে লাগানো হয় না। গবেষণায় উন্নয়ন অভিযাত্রায় সমস্যাগুলো চিহ্নিত হলেও তা সমাধানে বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

৫.২.৫.৩ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ চ্যানেল

সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম সফল হয়ে থাকে। একটা সমাজ ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। সামাজিক ভারসাম্য নির্ভর করে এসব প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্কের ওপর। বিষয়টি 'Biological Equivalence' এর মতোই। (আলী ও পারভীন, সালবিহীন)। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকার, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান– এদের আন্তঃসম্পর্কের ওপর দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। নানাবিধ কারণে এসব যোগাযোগ সম্পর্কিত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। (আলী ও পারভীন, সালবিহীন)। উন্নয়ন কার্যক্রম অনেক সময় সম্পাদনাকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিঘ্নিত হয়। যথাযথ যোগাযোগের অভাবে অনেক প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয় না। কার্যালয়/সচিবালয়, উপকরণ, লোকবলসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব, সংগঠনের মধ্যে অনীহা বা নিরুৎসাহ, প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব, তহবিল সমস্যা, সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য, তথ্যমূলক বইপত্রের স্বল্পতা এবং প্রচার ও প্রকাশনার স্বল্পতার কারণে এসব যোগাযোগ সংযোগহীনতা দেখা যায়।

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর মনোভঙ্গি। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিধিত্বের যোগাযোগ গড়ে তুলতে হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগ চ্যানেলসমূহ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ঐতিহ্যগত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিশেষ করে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, ভূমিহীন, মহিলা, এমনকি, যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। (Khan, 1979)। বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য হলেও সরকারি সংস্থাগুলোতো বটেই, এনজিওগুলোও প্রকৃত অর্থে তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফ্রেজার ও এস্ত্রাদা-রেসট্রেপো (১৯৯৮) বলেন, উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে দুটি বিষয়– যোগাযোগ ও জনগণের অংশগ্রহণের ওপর। কিন্তু এ দুটি বিষয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপেক্ষিত থেকে যায়। তাঁরা বলেন, 'Even though communication for development came into being in the 1960s, and has clearly shown its usefulness and impact in change and development actions, its role is still not understood and appreciated to the point that it is routinely included in development planning. (Fraser & Restrepo- Estrada, 1998).'

কৃষি বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম অনুষঙ্গ। কৃষি নিয়ে যোগাযোগ চ্যানেলগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। যখন ব্যক্তি, গবেষণাকর্মী, প্রতিষ্ঠান, গবেষণা, বিষয়, ফলাফল, প্রয়োগ পদ্ধতি, বাস্তবায়ন, ফলাফল ভিন্নতা পায়, তখন সব ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। Succesful communication requires a skillful communication sending a useful message through channels, effectively treated to a appropriate audience that responds as desired. (Mahboob, 1980)। গবেষণায় যোগাযোগের এসব প্রক্রিয়াগত দিকও অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাংলদেশে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানী, শিক্ষাদাতা, সম্প্রসারণকর্মী ও সম্পাদনকারী এজেন্সির প্রতিনিধি– এ তিনটি গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগের অভাব লক্ষণীয়। (Dawson, 1980)।

কৃষি গবেষণা ও তার বাস্তবায়নকারীর মধ্যে ফারাক রয়েছে। কৃষক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যোগাযোগহীনতা, রাজনৈতিক সংগঠন ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে এবং গবেষণা ও প্রকৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগের অভাব বিদ্যমান। (ইমাম, ১৯৯২)। এ সমস্যা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধরে নেয় হয়, গবেষণার ফল অনুযায়ী তা সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সরকারি নীতি-নির্ধারণে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগহীনতার পরিণাম কখনোই ফলপ্রসূ হয় না। বাংলাদেশে গবেষক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক/প্রশিক্ষক, সম্প্রসারণকর্মী ও সহায়তাদানকারী সংস্থার মধ্যে মতাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে আন্তঃদলীয় যোগাযোগের অভাব দৃশ্যমান হয়। এ দ্বন্দ্ব অনেক সময় পরস্পরকে না জানার অথবা জানার আগ্রহ থেকেও উৎসারিত। (ইমাম, ১৯৯২)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মাধ্যম উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখছে বা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সারা বছর অনুষ্ঠান হচ্ছে, এসব অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিংবা কতটুকু কার্যকর হচ্ছে, সে বিষয়টির প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। প্রতি অনুষ্ঠানের জন্য জরিপ, গবেষণা ও ফলাবর্তন জানার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। গণমাধ্যমের কার্যকারিতা, উপযোগিতা, অনুষ্ঠানের মান, পছন্দ– এসব বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত অবহেলিত। (Rahman & Ali, 1991)। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ চ্যানেলসমূহের সার্বিক মূল্যায়নের পর বলা যায়, একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা এবং ফলাবর্তন পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে উন্নয়ন যোগাযোগ প্রক্রিয়া কার্যকর হয় না। বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ সংযুক্তি বিষয়ে আলোচনার পর যেসব বিষয় স্পষ্ট তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

* বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য সব ধরনের যোগাযোগ সংযুক্তি রয়েছে। তবে গণমাধ্যম এখনো সব উদ্দিষ্ট জনগণের কাছে পৌঁছায়নি।
* উন্নয়নের জন্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বাস করে গ্রামে। অথচ গণমাধ্যমের আধেয় নির্মাণে এখনো গ্রামমুখিতা গড়ে ওঠেনি। সংবাদপত্রগুলো ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন গৌণ। ফলে উন্নয়ন যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য এখানে হোঁচট খায়। শিক্ষার হারের স্বল্পতার কারণে মুদ্রণ মাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না।
* রেডিও-টিভিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবারকল্যাণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বিষয় প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এসব মাধ্যম না পৌঁছায় তা পুরোপুরি সফল হতে পারছে না। উন্নয়নের অন্যতম খাত কৃষিক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।
* বাংলাদেশে উন্নয়নে দেশজ মাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে– এমন আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে পথনাটক, গম্ভীরা প্রভৃতি দেশজ মাধ্যমকে পরিবার পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য দেশজ মাধ্যম উন্নয়ন কার্যক্রমে কোনো না কোনোভাবে কাজ করছে।
* আন্তর্ব্যক্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সরকারের এসব সংস্থার মধ্যে ও একই সংস্থার বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে যোগাযোগহীনতা বা সমন্বয়ের অভাবে উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন যোগাযোগ পদ্ধতি অনেকটাই অনুপস্থিত।
* বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য খুবই ইতিবাচক।
* সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম এবং আন্তর্ব্যক্তিক মাধ্যমের ব্যবহার করছে, যা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
* বেশির ভাগ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা তাদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমর্থন আদায়, সামাজিক সংঘবদ্ধতা, কর্মসূচি যোগাযোগ, গবেষণা ও উন্নয়ন– এ চারটি যোগাযোগ পর্যায়কে গুরুত্ব দিচ্ছে।
* উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার, সম্প্রসারণকর্মী, দাতাসংস্থা, এনজিও, গবেষক ও প্রশিক্ষক এদের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগহীনতা কাজ করে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। তবুও এ যোগাযোগহীনতার কারণে এখন পর্যন্ত ভালো ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বস্তুত, উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মাধ্যম সংযুক্তির সন্তোষজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়নে যোগাযোগ সংযোগ শর্তটি পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না।

৫.৩ বাংলাদেশে যোগাযোগ মাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা

কোন পদ্ধতিকে এবং কোন মাধ্যম ব্যবহার করে উন্নয়ন বার্তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো যাবে এবং কীভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা তথ্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ব্যবহার করতে পারবে, তা বিবেচনা করা আবশ্যক। এসব তাত্ত্বিক পটভূমি বিবেচনা করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসহ আরও কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতার বিষয়টি আলোচনার পূর্বে প্রবেশযোগ্যতার তিনটি

শর্ত (প্রযুক্তিগত, তত্ত্বগত এবং গণমাধ্যমের সম্ভাব্য প্রসার) বাংলাদেশে পূরণ হয়েছে কিনা, তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের আয়তন ৫৫ হাজার ৫৯৮ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৬ কোটি। গণমাধ্যমের যদি সারাদেশে বার্তা পাঠানোর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে উন্নয়ন তথ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র ও ১৪টি রিলে স্টেশনের মাধ্যমে শতকরা ৯৭ ভাগ জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে। ২০০৪ সাল থেকে বিটিভি ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়েছে। আর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ বেতার ১৯৭৬ সাল থেকে সারাদেশে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। (Salam, 1997)। ওই সময় এক হাজার কিলোওয়াট তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানকে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল ছাড়াও ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীনসহ বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ১৪টি, শর্টওয়েব ৯টি এবং এফএম ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ২৯টি। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, বরিশাল এবং কুমিল্লা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে গণমাধ্যমসমূহ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। জনগণ গণমাধ্যমের বার্তা গ্রহণ করলে উন্নয়ন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়ন বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, উন্নয়ন যোগাযোগ এখনও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তবে গণমাধ্যমের প্রসার হওয়ার উন্নয়ন যোগাযোগের একটা ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যাচ্ছে। কেননা বিদ্যুতায়িত এলাকার পরিমাণ এবং শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা বা জনগণের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগের ওপর উন্নয়ন যোগাযোগ শর্ত নিহিত, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতার ব্যাপারটি বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থনৈতিক কারণে এখানে গণমাধ্যমের বিকাশ হয়নি। ষাটের দশকে গবেষণায় দেখা যায় উন্নয়নের সাথে গণমাধ্যমের বিকাশের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। লার্নার এবং শ্র্যাম উভয়ই দেখিয়েছিলেন- যে দেশ যত উন্নত সে দেশে গণমাধ্যমের প্রাপ্যতা তত বেশি, বিপরীতভাবে যে দেশ যত অনুন্নত সে দেশে গণমাধ্যমের প্রাপ্যতা তত কম। শ্র্যাম বলেন, 'The less developed countries have less developed mass communication systems also, and less development in the services that support the growth of mass communication (Schramm, 1964).'

অধিকসংখ্যক লোক যাতে গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্যে ইউনেস্কো কমপক্ষে কী পরিমাণ গণমাধ্যম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে থাকা দরকার তার একটি মানদণ্ড তুলে ধরেছে। ইউনেস্কোর মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতি ১০০ জন লোকের ১০টা সংবাদপত্র, পাঁচটি রেডিও সেট, দুটি টিভি সেট ও দুটি চলচ্চিত্র আসন থাকতে হবে (Schramm, 1964)।

এক হাজার লোকের মধ্যে ৬৭ জনের রেডিও সেট এবং সাতজনের টেলিভিশন সেট রয়েছে এবং ছয়জন সংবাদপত্র রাখে। (Online, 2004)। বিদ্যুৎ বিভাগের (২০১৫) তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ৬৮ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা পায়। তাই গ্রামে এখনও টেলিভিশন সেট ব্যবহারের হার কম। তবে শহরে টেলিভিশন সেট ব্যবহারের হার ৬৯ শতাংশ (১৯৯৯) থেকে বেড়ে ৯১ শতাংশ (২০১১) হয়েছে। তবে গ্রামে টেলিভিশন দেখার হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে ২৪ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। রেডিও শোনার হার ৩৬ শতাংশ (১৯৯৯) থেকে কমে ১৫ শতাংশ (২০১১) দাঁড়িয়েছে। তবে মোবাইল ফোনে রেডিও শোনে ৭৩ শতাংশ জনগণ এবং ৩৪ শতাংশ রেডিও সেট ব্যবহার করে। প্রতি পাঁচজনে একজন রেডিও শোনে না বা টেলিভিশন দেখে না। ২০ শতাংশ জনগণের কোনো ধরনের মাধ্যমের প্রবেশযোগ্যতা নেই। (National Media Survey, 2011)। সংবাদপত্রের পাঠক প্রধানত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামে এখনও সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা খুবই নগণ্য। মাত্র ৪০ শতাংশ পুরুষ এবং ১৩ শতাংশ নারী সপ্তাহে অন্তত একবার সংবাদপত্র পড়ে। (National Media Survey, 2011)। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা শীর্ষক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা ৫০ লাখের ওপরে। যেখানে দেশে এক হাজার ৫০০ প্রেক্ষাগৃহ ছিল, সেখানে ২০১১ সালে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৬০০তে দাঁড়ায় (Ethirajan, 2011)।

এটা ঠিক যে, দেশে ইলেকট্রনিক মাধ্যম দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামেই অন্তত একটি রেডিও সেট রয়েছে (লিপন, ১৯৯৮)। কিন্তু অধিক মূল্য এবং বিদ্যুৎ সুবিধার অভাবে টেলিভিশন সব জায়গায় দেখা যায় না। বৈদ্যুতিক সুবিধা এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাবে টেলিভিশন এখনও উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে টিভি অনেক দূরে। (রহমান, ১৯৯৬-১৯৯৭)। এসব কারণে টিভির অনুষ্ঠানসূচি বিশেষ শ্রেণিকে লক্ষ করেই তৈরি করা হয়। উন্নয়নবিষয়ক অনুষ্ঠান উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে না।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের তথ্যানুযায়ী দেশে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ২০ হাজার এবং মোবাইল মাধ্যমসহ নিয়মিত ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ কোটি ৪১ লক্ষ ২০ হাজার।

বাংলাদেশে যোগাযোগের প্রবেশযোগ্যতা উন্নয়ন যোগাযোগের শর্তটি আলোচনা করার কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

* যোগাযোগের প্রবেশযোগ্যতার শর্ত অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যাপারটি বাংলাদেশে পরিপূর্ণতা পেয়েছে।
* গণমাধ্যম ব্যবহারের হার ক্রমাগত বাড়ছে।
* শিক্ষার হার যেহেতু কম, তাই সংবাদপত্র সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না। আর টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিশেষ শ্রেণিকে লক্ষ করে প্রচারিত হচ্ছে। আর রেডিও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নাগালের মধ্যে থাকলেও তাদের চাহিদা অনুযায়ী বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে না।
* প্রয়োজনীয় গণমাধ্যম থাকা সত্ত্বেও সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারছে না। যেমন: ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। কারণ এদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্তা পরিবেশিত হয় না।
* বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জনগণের নিকট এ দুটি মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা কম। এজন্য উন্নয়ন বার্তা পাওয়ার পরও তা অনেক সময় গৃহীত হয় না।

উন্নয়ন বার্তা প্রণয়ন একটি কৌশলগত চলমান কার্যক্রম। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ যোগাযোগকর্মীকে সমস্যা ও চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণের পর মানসম্পন্ন এবং উপযোগী বার্তা প্রণয়ন করতে হয়। অতঃপর বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য এবং করণীয় সহজভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এরপরই আসে এ সম্পর্কিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, গুরুত্ব ও অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে যথাসময়ে সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন ও পরিবেশন করা। তথ্য যথাযথভাবে পৌঁছানোর মাধ্যম নির্বাচনের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। কিন্তু উন্নয়ন বার্তা প্রেরণকারীরা এসব চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে যোগাযোগের প্রবেশযোগ্যতার ক্ষেত্রে এখনও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। গণমাধ্যম জনগণের নাগালের মধ্যে পৌঁছাতে পারিনি। তাছাড়া উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী বার্তা পরিবেশিত না হওয়ায় উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রম কার্যকর হতে পারছে না। উন্নয়ন বার্তা তৈরি ও প্রচার প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সত্যিকার অর্থে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা বলা হলেও তা কাগজে-কলমেই অনুসরণ করা হয়, সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রমে ফলাবর্তন পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েই গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত উন্নয়ন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন না করেই 'সচেতনতামূলক কার্যক্রম' বা 'ক্যাম্পেইন' প্রভৃতি অভিধা চয়ন করে উন্নয়ন যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। আর এসব 'সচেতনতামূলক কার্যক্রম' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনয়ন করা হয় 'learning by doing' অর্থাৎ কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা পদ্ধতিতে। (Haque, 2015)। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দিলে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করা বা কাজের অভিজ্ঞতায় নতুন কোনো কৌশল ভালো মনে হলে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ পদ্ধতিতে। এতে বারবার যোগাযোগ কর্মসূচি পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে, সময় বেশি প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো বাস্তবায়ন কর্মসূচি বন্ধ ঘোষণা করতে হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়ন যোগাযোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ড. রিজওয়ান-উল-আলম তাঁর 'উন্নয়ন যোগাযোগ: বাংলাদেশে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক

প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। (ফেরদৌস, সম্পাদিত, ২০০৫)। এগুলো হলো: বাংলাদেশের উন্নয়ন যোগাযোগ হলো গণমাধ্যমনির্ভর। জনগণের অংশগ্রহণের নামে এক ধরনের প্রহসন করা হয়। সামাগ্রিক যোগাযোগ প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় আনতে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা হয় না। উন্নয়ন যেগাযোগ দাতাদের সাহায্যনির্ভর। আচরণ পরিবর্তনের জন্য যেসব তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইসি) উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে, তার বেশির ভাগই জনগণের উপযোগী নয়। এগুলোর বিতরণ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়ানির্ভর। সংরক্ষণ পদ্ধতি সর্বাধুনিক নয়। মনিটরিং ব্যবস্থা যথাযথ নয়। সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব রয়েছে। যোগাযোগ উপকরণের উৎপাদন খরচ বেশি। একই বার্তা অনেকগুলো সংস্থার মাধ্যমে উৎপন্ন হওয়ায় বিভ্রান্তি বাড়ে এবং একটি নির্দিষ্ট আন্তঃর্ব্যক্তিক চ্যানেল, যেমন- স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর নির্ভর করায় বার্তা কার্যকরভাবে পৌছাতে পারে না।

মূলত উপরিউক্ত কারণেই বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগের শর্তসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উন্নয়ন যোগাযোগ প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল একটি জটিল, তত্ত্বগত, জ্ঞানগত এবং প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ প্রয়াস। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে উন্নয়ন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে নানা নান্দনিক ধারা ও কৌশল। এর গতি, ব্যাপ্তি, সৌন্দর্য, মাত্রা এবং মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এ যুগে মানুষের চাহিদা ও সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবেশ ঘটেছে আধুনিক জীবনের নানা উপাদান ও উপকরণের। মানুষ তাই খোঁজে বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব কিংবা চমকপ্রদ নির্মাণশৈলী। এসব বিষয় বিবেচনা করে যোগাযোগবিদদের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপযোগী উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। আর তাহলেই জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১. আল-মামুন, আবদুল্লাহ (১৯৯৮). উন্নয়ন যোগোযোগ দেশজ মাধ্যম: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, যোগাযোগ, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

২. আলী, আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ এবং পারভীন, সিতারা (সালবিহীন), গণমাধ্যমের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬২।

৩. আজীজ, একেএম আবদুল (১৯৯৮). স্বাস্থ্যতথ্য এবং গণযোগাযোগ কর্মসূচি: নিরীক্ষা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৮৮তম সংখ্যা।

৪. ইমাম, মুহাম্মাদ হাসান (১৯৯২). কৃষি গবেষণা: মিলিত লক্ষ্য সীমিত সমন্বয়, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, জুন, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৫. ইসলাম, মো. সফিকুল (সালহীন). উন্নয়ন যোগাযোগ: সাম্প্রতিক ভাবনা, সমাজ নিরীক্ষণ, ৬০ সংখ্যা।

৬. ইসলাম, খাদেমুল (১৯৯৮). জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেডিও'র ভূমিকা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, পঞ্চম সংখ্যা।

৭. উদ্দিন, মো. আনসার (১৯৯২). স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা এবং জনগণের অংশগ্রহণ সমস্যা ও সম্ভবনা, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৮. কৃষি তথ্য সার্ভিস (২০১৫). [Online], available: www.ais.gov.bd [2015, June 3].

৯. প্রথম আলো (২০১৬). বিটিভির দর্শক, আয় কমছে, ঋণ করে চ্যানেল বাড়াচ্ছে, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৬।

১০. বায়েস, আবদুল ও হোসেন, মাহবুব (২০০৮). গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি: জীবন-জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, ঢাকা: রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং স্বরাজ প্রকাশনী।

১১. রহমান, কাজী মাহমুদুর (১৯৯৬-৯৭). বাংলাদেশ বেতারের ২৫ বছর, নিরীক্ষা, নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি, ৭৮তম সংখ্যা, প্রেস ইনিস্টিটিউট অব বাংলাদেশ।

১২. শ্যাম, উইলবার (১৯৯৩). মানুষ, মাধ্যম ও যোগাযোগ, অনুবাদ: তালুকদার ইকবাল হোসেন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৩. খান, ড. ফজলুর রশিদ (১৯৯৮). প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, ৫ম সংখ্যা।

১৪. ফেরদৌস, জান্নাতুল, সম্পাদিত (২০০৫). উন্নয়ন যোগাযোগ: বাংলাদেশে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা, ঢাকা: ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

১৫. লিপন, সহিদ উল্যাহ (সালবিহীন). স্যাটেলাইট টিভি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, নিরীক্ষা, ৭৪তম সংখ্যা।

১৬. লিপন, সহিদ উল্লাহ (১৯৯৮). জুলাই-সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশে দুটি সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের কভারেজ: একটি পর্যালোচনা, যোগাযোগ, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

17. Anam, Mahfuz (2002). The Media and Development in Bangladesh, The Right to Tell: The Role of Mass Media in Econonomic Development, World Bank Institute.

18. Bassette, Guy (2006). People, Land, and Water: Participatory Development Communication for Natural Resource Management. London: Earthscan and the International Development Research Centre.

19. BTV (2015). Bangladesh Television, [Online], Available: http://192.185.168.156/~btvgov/ [2015, January 25].

20. BCAS (2000). Summary report on Assessing the Problems of Foodgrain Marketing and Food Distribution System in relation to Achieving Food Security in Bangladesh.

21. Chowdhury, D. Pault (1978). New Partnership in Rural Development, New Delhi: MN Publisher.

22. Dawson, M.D. (1980). The problem Relating to Communication within an Organization, In Procceding Of Second National—-BARC, Dhaka.

23. Ethirajan, Anbarasan (2011). Bangladeshi film industry's fight for survival, [Online], Available: http://www.bbc.co.uk/ news/business-15178289 [2015, January 27].

24. Fraser, Colin & Restrepo-Estrada, Sonia (1998). Communicating for Development, London: I.B. Tauris & Co Ltd.

25. Haque, Mahmudul (2015). Health Communication: NGO Approaches in Bangladesh. In Press.

26. IFAD (2014): Rural poverty in Bangladesh, Rural Poverty Portal of Inernational Fund for Agricutural Development, [Online], Available: www.ruralpovertyportal.org/ country/home/tags/bangladesh [2014, January 2].

27. InfoAsia (2012): Bangladesh: Media and Telecoms Landscape Guide, [Online]. Available: http://www.cdac-network.org/tools-and-resources/i/ 20140613150126-yukwt [2015, January 27].

28. Kabir, M Khairul & Bhattacharjee, Milan Kanti (1994). Impact of Radio and Television Programmes on Rural People, Comilla: BARD.

29. Khan, AZM Obaidullah (1979): Participatory Development: Bangkok: UNAPDI.

30. Kumar, Dr Rajesh (2011): Development Communication: A Purposive Communication with Social Conscience-An Indian Perspective, Global Media Journal-Indian Edition, Vol 2, No-2.

31. National Media Survey (2011): ACNielsen.

32. Mahbboob, S.G (1980): Administrative communication within an organization, In Proceedings of Second National…..BARC, Dhaka.

33. Nora C. Quebral (2012): *Development Communication Primer*. Penang: Southbound.

34. Online, (2004). Available: http://www.populstat.info/Asia/bangladg.htm [2015, January 27].

35. Paul, Jillur Rahaman (2010). Development Communication at BARD, Proshikhyan, vol, no 1, Dhaka: Bangladesh Society for Training and Development.

36. Quebral, Nora C (1975). Development *Communication; Where Does it Stand Today*, Media Asia, Vol. 2 (4).

37. Rahman, M. Golam & Ali, Ahaduzzaman M, (1991). Broadcast Media for Public Service: Acecss, Exposure and Impact, Dhaka: Unicef.

38. Salam, Shaik Abdus (1997). Mass Media in Bangladesh, Newpaper, Radio and Television, South Asian News Agency.

39. Schramm, Willbur (1964): Mass Media and National Development, California Standford University Press.

লেখক: মেট্রোএডিটর, ডেইলি স্টার

উন্নয়ন যোগাযোগ ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

ড. মাহাবুবুর রহমান

ভূমিকা

২০১৫ সাল অতিক্রান্ত হয়েছে ইতোমধ্যেই। সালটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর (এমডিজি) লক্ষ্য পূরণের সাল ছিল। লক্ষ্য কতটা পূরণ হয়েছে, সেটার চুলচেরা বিশ্লেষণ পেতে আমাদের হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বর্তমানে উন্নয়নের যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তা বিশ্বের দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু বিশ্বসম্প্রদায় এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মিলেনিয়াম ডিক্লারেশনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, যাতে ২০০০ সালে স্বাক্ষর করেছিল ১৮৯টি দেশের নেতারা। বর্তমানে বিশ্বের প্রতি পাঁচজন মানুষের

অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এমন ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, ... এমনকি যোগাযোগ উন্নয়নমূলক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন প্রকল্প ও নীতিনির্ধারণকেও তত্ত্বাবধান করে

দুইজনকে দুই ডলারের কম অর্থে জীবনধারণ করতে হয়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ধারণা করছে যে, ২০১৬ সালে এসেও ছয়শ' মিলিয়নের বেশি মানুষ আছে, যাদের এক ডলার পরিমাণ অর্থে জীবনধারণ করতে হচ্ছে (Balit,2016)। এ থেকেই এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বসম্প্রদায় কতখানি সফল, তার পরিষ্কার নমুনা পাওয়া যায়। এমডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণকল্পে বৈশ্বিক সম্প্রদায় ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নামে আরো একটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে।

উন্নয়নশীল দেশের লাখ-লাখ মানুষকে চরম দরিদ্রতা থেকে বের করে আনা কি খুব কঠিন? সারাবিশ্ব আজ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাখ্যার সঙ্গে এ প্রশ্নের বড় ধরনের যোগসূত্র রয়েছে। একটি দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তার নেতৃত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং দেশের সীমানা ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিরোধিতার সামগ্রিক রূপ– এগুলো সবই এর সঙ্গে সম্পর্কিত (Andand & Sen,1996)। পক্ষান্তরে এই বিষয়গুলো প্রভাবিত হয় বড় ধরনের আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত বন্ধুত্ব, বাণিজ্য নীতি, আন্তর্জাতিক ঋণ মওকুফের মাত্রা ও ধরন এবং ত্রাণ সাহায্যের ওপর ভিত্তি করে। যাই হোক না কেন, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নকর্মী, বিশেষজ্ঞদের মধ্যে

এই বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বেশ মতানৈক্য লক্ষ করা যায় (Bass and Rouse,1997)। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে যে ইস্যুগুলো প্রথমেই আমাদের সামনে চলে আসে তা হলো:

–আন্তর্জাতিক দাতাসম্প্রদায় 'সুশাসন'-এর ধারণার ওপর জোর গুরুত্বারোপ করে চলেছে। সুশাসনের ধারণাটি একটি রাষ্ট্রের প্রধান কার্যাবলি পালন করার সক্ষমতা, নাগরিকদের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রতি দায়িত্বশীলতা, টেকসই ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কী করা হচ্ছে, তা জনগণকে জানানোর ওপর নির্ভর করে এবং এসব বিষয়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

–কার্যকর উন্নয়নের জন্য সুশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য জন-ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেখানে দেশের জনগণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলবে। অবাধ ও নিয়ন্ত্রিত বাজারের জন্য যথার্থ ভারসাম্য বজায় রাখা, সমতা ও কর্মদক্ষতার গ্রহণযোগ্য মাত্রা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর 'অবাধ' ও 'নিয়ন্ত্রিত' বাণিজ্য নীতির প্রভাব–এ সকল বিষয় নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। (Berrigan,1979)। তবে সব অর্থনীতিবিদই যথাযথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদ ও মূলধনের বৈধ সুরক্ষা, শিক্ষিত শ্রমশক্তি গঠন এবং আদর্শ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন (Balit, 2005)।

বর্তমান নিবন্ধে দেখানো হয়েছে সফল বা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যথাযথ তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া। আর তথ্য ও যোগাযোগ হলো সুশাসনের প্রাণ; একটি সুষ্ঠু, সংবেদনশীল সুশীল সমাজ ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতার অখণ্ডিত অংশ; যথার্থ ও কার্যকরী অর্থনীতির জন্যও অপরিহার্য এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। (Boafo, 1993)। আর উন্নয়নের মূলে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ। উন্নয়নকে 'টেকসই' হতে হলে অবশ্যই একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। (Adhikarya,1996)। এই প্রক্রিয়ায় যাদের নিয়ে কাজ করা হবে সেসব মানুষের ব্যবহৃত মাধ্যম দিয়েই তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। একক বা সামগ্রিকভাবে কাজ করলেও তাদের কৌশলই ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের চিন্তাচেতনা, চর্চা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করে এই পরিবর্তনের পথ খুঁজতে হবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একে 'প্রকৃত স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত স্বাধীনতায় মানুষ তার যোগ্যতাবলে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়, যা তাদের প্রভাবিত করে এবং তারা নির্দিষ্ট 'ফাংশনাল' আকৃতিতে একটি সুন্দর জীবন গঠন করে ও উপভোগ করে। এই প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করে এই সক্ষম মানুষগুলোকে আরো অর্থপূর্ণ তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং তথ্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। এই সক্ষম মানুষের বিশাল একটা অংশ অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে, উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে এবং সাড়া প্রদানের মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে ওঠে; যেন তারা রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব নিতে পারে। আর এটিই দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই পরিবর্তন প্রতিষ্ঠায় মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। (Coldevin, 2003)।

অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এমন ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, কার্যকর যোগাযোগই তাদের সফলতার মূল। এমনকি যোগাযোগ উন্নয়নমূলক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন প্রকল্প ও নীতিনির্ধারণকেও তত্ত্বাবধান করে। প্রায়ই দেখা যায়, নীতিনির্ধারকরা যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে জোরালো করার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেবেন সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। (Abraham et al., 1990)। মাঝে-মধ্যে তারা জানলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা ভেবে কিছুই করতে পারে না। যোগাযোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে পারছে এবং বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ও অভিজ্ঞতা-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কার্যকর উন্নয়ন পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য যোগাযোগের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয় (Balit, 2004)। বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে:

উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সুশাসন

১. উন্নয়ন

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত হবেন যে, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পদ্ধতির অসংগতির তাগিদ থেকে উন্নয়নের উদ্ভব। (Berrigan,1979)। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মানুষের পার্থিব বা আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন; আর এর মূলে রয়েছে সারাবিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমান অধিকার; মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ; কোনো ব্যক্তির জীবন ও অবস্থার ওপর নিজস্ব পছন্দ, আত্মবিশ্বাস, ক্ষমতার উন্নয়ন ও টেকসই যোগ্যতা। বসতবাড়ি ও সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তবে এই লক্ষ্যগুলো একবারে অর্জন করা সম্ভব না। এগুলো অর্জনের জন্য কথোপকথন, প্রতিযোগিতা, সমঝোতা, বিনিময়, অভিযোজন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো চলমান প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হবে, যেখানে দরিদ্র ও প্রান্তিকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে। বৃহৎ অর্থে এটিই হলো যোগাযোগ প্রক্রিয়া। (Elliot,1994)।

বর্তমানে অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনাই দরিদ্রতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমানের ধরন, জীবনযাত্রার সমতায়নে অন্যান্য উপাদানের অবদান ও দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণে অসমতা– এই বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষক একমত হবেন যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের যেকোনো উন্নয়ন এবং তা দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করার জন্য অবশ্যই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে জোরালো করতে হবে। (Adhikarya et al., 1987)। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রান্তিক ও ক্ষমতাহীন দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ এই সংজ্ঞায়নে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হলেও তারা অনেক ধরনের যোগাযোগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যোগাযোগের অন্যতম দিক হলো তথ্য গ্রহণ করা। শিক্ষার অভাব, তথ্যপ্রাপ্তির স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান, মানসম্মত ভাষায় কথা বলতে না পারা এবং বিদ্যুতের অভাবে যেসব লোক রেডিও শুনতে ও টিভি দেখতে পারে না; এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের তথ্য গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। যোগাযোগের অন্য দিকটি হলো তথ্য প্রদানের ক্ষমতা; যা কারো কথা শোনার পর আলোচনা ও তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষ যে নিজেদের কথা শুনবে সেক্ষেত্রেও সীমিত, ক্ষমতাধরদের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন; এমনকি মোবাইল ফোন ছড়িয়ে পড়ার আগে অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের তেমন কোনো মাধ্যম পর্যন্ত ছিল না (Balit, 2005)। এদিকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যেমন ব্যয়বহুল একই সঙ্গে প্রয়োজন ব্যবহার করার দক্ষতা, দরকার সামর্থ্য। কোনো জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি ও ক্ষমতা কাঠামো প্রায়ই কোনো একশ্রেণির বিশেষ করে নারীকে মতামতের অধিকার বা চুপ করে থাকতে বাধ্য করে। এভাবে অধিকাংশ সমাজেই উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কিংবা অবদানের স্বীকৃতি মেলে না। দরিদ্র মানুষের তথ্য আদান-প্রদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুধু উন্নয়নশীল নয় অধিকাংশ জাতির জীবনধারণের মানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব (Coldevin, 2003)।

২. যোগাযোগ

ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ– এসবই হলো সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানে 'যোগাযোগ বাস্তুসংস্থানের' অংশ; আর যোগাযোগের এই ধারণা সম্পর্কেই এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিকল্পিত যোগাযোগ প্রচারণা (উদাহরণস্বরূপ স্বাস্থ্য, রাজনীতি বা শিক্ষা) থেকে শুরু করে যোগাযোগের অপরিকল্পিত প্রবাহ (যেমন- ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়া, অপরিচিত জনতা ও ভার্চুয়াল সম্পর্কের মাধ্যমে বৈশ্বিক যোগাযোগ) সব ধরনের যোগাযোগই এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; এমনকি শিল্প ও বিনোদনের মতো তথ্যও। তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার মতোই জ্ঞান ও তথ্যের সম্মিলন বা নির্দেশনার প্রক্রিয়াও যোগাযোগের অংশ।

৩. উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ

উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার জন্য যোগাযোগের স্বীকৃত গুরুত্ব নতুন নয়। ৫০ বছর ধরে যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে এবং যোগাযোগের উদ্দেশ্য হলো প্রাপককে তথ্য ও ধারণা দেয়া। যোগাযোগের লক্ষ্যমাত্রা হলো তথ্যকে স্থানান্তরিত করে একটি এলাকার মানুষকে প্রভাবিত করে তাদের আচরণের পরিবর্তন আনা যেমন কৃষিকাজ, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ইত্যাদি। প্রথমত, যোগাযোগ একটি সহজ বিষয়ে প্রাপকের কাছে বার্তা পাঠায়। (Boafo, 1993)। সামাজিক বিষয়াবলিতে প্রাপককে বার্তা ও ধারণা দিয়ে বিজ্ঞাপন শিল্পও কিছুটা প্রভাবিত করে। সামাজিকবিষয়ক তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকারীদের উদ্দেশ্য হলো কীভাবে বলা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা ও তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা। (Andand & Sen, 1996)। পরিকল্পিত যোগাযোগ প্রবাহ, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অর্জন, মিডিয়ার বিভিন্ন

ব্যবহার এবং যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি আলোচনা, বিতর্ক। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা পায় এবং প্রাপক আলোচনার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকলে যোগাযোগের পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। শুধু তাই নয় আরেকটি মৌলিক ধারণা হলো, উন্নয়নের পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নারী যদি তার যৌন সহযোগীর সাথে কনডম ব্যবহার না করতে চায় তাহলে ওই ব্যক্তিকে তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা যাবে না। আর যদি সেই নারী কনডম ব্যবহার করতে পছন্দ করে তাহলে এটা ইতিবাচক পরিবর্তন, যা ওই সমাজের জন্য আদর্শস্বরূপ। (Berrigan, 1979)। সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত পথ ও মত অনুযায়ী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের মতামত প্রচার করবে ও বিশ্লেষণ করবে এবং এভাবেই যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হবে। আর এর ওপরই নির্ভর করবে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন করার জন্য নতুন নতুন জ্ঞান ও ধারণা কতটুকু কার্যকর হবে তা (Balit, 1999)।

একটি সমাজের সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন হওয়া আবশ্যিক, যা যোগাযোগ প্রক্রিয়া দেখে বোঝা যায়। (Boafo, 1993)। যদি যোগাযোগের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক হয়। উন্নয়ন যোগাযোগের সমর্থক হিসেবে শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের তথ্য ও সমর্থন প্রযোজ্য নয়। তার মানে সকলের অংশগ্রহণ, ব্যাপক তথ্য, যোগাযোগ চ্যানেলের সঠিক ব্যবহার, একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন যোগাযোগে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের খুব সহজ লক্ষ্য দিয়ে প্রভাবিত করতে হবে। কিন্তু সকল অংশগ্রহণকারীকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে হবে, যা সম্পূর্ণভাবে নতুন কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ, যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল (Coldevin, 2008)। একের অধিক সংস্থা এতে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছিল। তথ্য ও জনমত এ দু'টি মাধ্যমের ওপর উন্নয়ন সংস্থাগুলো নির্ভর করে। সরকার ও রাজনৈতিক রীতিনীতি ব্যাখ্যা করা, তর্কবিতর্কের আলাদা জায়গা তৈরি করা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা-আলাদা আলোচনা ও সমালোচনা এবং তথ্য দেয়া ও জনমত তৈরিতে গণমাধ্যমগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। (Bass and Rouse,1997)। তথ্য আদান-প্রদানের অন্যতম সহজ মাধ্যমগুলোর মধ্যে যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলোকে (টেলিফোন, রেডিও, স্যাটেলাইট) আলাদা করা যায় না। যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো ব্যবহার করা না হয়। সুতরাং প্রযুক্তিগুলো সত্যি উন্নত সুবিধাদানে সক্ষম বা অক্ষম সেটি তখনই বলা যাবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের মধ্যে সেগুলোর ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলা যাবে। নব্বইয়ের দশকে আইসিটি সম্পর্কে অতিরিক্ত আশাবাদ ছিল যে, প্রযুক্তি নিজেই সমাজ পরিবর্তন করতে পারবে কিন্তু গ্রাম্য টেলিসেন্টারসহ অনেক প্রকল্পে হতাশাজনক ফলাফল এসেছিল। অভিজ্ঞরা দেখিয়ে ছিল যে, প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে খরচের উপযুক্ততা, দক্ষতা ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মাধ্যমের অভাব এবং প্রচলিত প্রযুক্তি ও উন্নত প্রযুক্তির মধ্যে কোনটির ব্যবহার বেশি উপযুক্ত ছিল, তা নির্বাচনে নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারা মতামত দেয় যে, নতুন মাধ্যম শুরু করার আগে, প্রচলিত মাধ্যমটির চেয়ে উন্নত মাধ্যমটি যোগ্যতার দিক দিয়ে শক্তিশালী কিনা এবং বেশি সুবিধা দেবে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। (Adhikarya et al., 1987)। আমাদের সব মাধ্যমকেই আমরা শুরুতে উন্নত দৃষ্টিতে দেখি না। মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয় মতামতকে প্রভাবিত করতে, সত্যকে লুকাতে বা ধ্বংস করতে এবং শক্তিশালী শ্রেণির আগ্রহ তৈরি করতে। আবার এগুলোর দ্বারা সাধারণ জনগণ অত্যাচারিত হয়। মাধ্যমগুলোর অতিরিক্ত সুবিধা কখনো কখনো তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিচক্ষণতা, স্বচ্ছতা ও জনপ্রিয়তা নীতি এবং সাবধানতা প্রক্রিয়ার একটি অংশ হতে পারে। কিন্তু একটি উন্মুক্ত সমাজের দায়িত্ব হওয়া উচিত তাদের ভালো সদস্যদের খারাপ সদস্য হতে পৃথক করা এবং খারাপ সদস্যদের থেকে প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা থেকে দূরে রাখা। সদস্যদের অবশ্যই তাদের নিজেদের আগ্রহগুলো চিনতে হবে, জীবনধারণ প্রক্রিয়াকে সংগ্রামী করতে হবে, নিজেদের জীবনের অর্থ খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে মিডিয়াভাবাপন্ন ভাব জাগ্রত করতে হবে। এ দলগুলোকে যারা সচরাচর প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের মতামতকে সোচ্চার করার অভ্যাস ও জনগণকে তাদের মতামত পৌঁছে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। (Balit, 1988)।

পাঁচ বছরেরও আগে ইউরোপে বর্তমান প্রিন্টিং প্রেসের যাত্রা শুরু হয়। যা জ্ঞান, তথ্য, বিবর্তন ও পরিবর্তনে ক্রমবর্ধমান প্রবেশাধিকার পায়। গত দুই দশকের বিস্ফোরক বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় গুটেনবার্গ বিপ্লব আনে আইসিটি, যা দুইভাবে রূপান্তরিত হয়। ১. জনমত, ২. তথ্যের ভাগাভাগি। ফলে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের। (Byers,1996)। যোগাযোগের এই বিপ্লবের ফলে আবির্ভাব ঘটে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং নতুন গণমাধ্যম চ্যানেল, যার অফুরন্ত সুবিধার ফলে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করে অধিক তথ্য ও জ্ঞান। যারা এগুলো ব্যবহার করছে তাদের জীবনমানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে- একথা বলার জন্য এখন আর তথ্য-উপাত্ত হাজির করার দরকার পড়ে না। (ECOSOC, 2003)। কিন্তু এটা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কতখানি কমাতে পেরেছে সেটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। যাদের মধ্যে দক্ষতা আছে এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করছে তারা আনন্দের সঙ্গে নতুন তথ্য ও যোগাযোগ চ্যানেল উপভোগ করছে এবং বিপরীত মেরুর জন্য এটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এমডিজি'র বিস্তৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক মনোযোগ দেয়া হয়েছিল নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে। (Baskaran,1990)। ২০১০ সালে বৈশ্বিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দাতা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারপ্রধানরা নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়কে ভুলে যেতে চেয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে উন্নয়নের জন্য কার্যকরীভাবে কাজ করবে। ২০০৫ সালের মার্চে তারা উন্নত ও অধিক কার্যকরী ব্যবস্থাপনা সৃষ্টির জন্য সমন্বিত ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (Olivera, 2006)।

সবশেষে যোগাযোগ ও তথ্য প্রক্রিয়ার প্রভাব সমাজের গঠন-কাঠামোতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। যারা তথ্যের অবাধ প্রবাহে যুক্ত হচ্ছে তারা সবসময় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকেন। মোবাইল ফোন, নাগরিক সাংবাদিকতা, ব্লগ, আঞ্চলিক সম্প্রচার, ইন্টারনেটের বিস্তৃতি সরকার এবং মূলধারার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৩. উন্নয়ন ও সুশাসন

সঠিক ও গঠনমূলক রাজনীতি হতে পারে উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি কিন্তু দ্বিমুখী এবং বহুমুখী সাহায্যকারী ও দাতা সংস্থাগুলো গ্রহীতা দেশের রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক বা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ নয়; কারণ তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতিনীতি লঙ্ঘন এবং সরকারি অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও প্রতিনিয়তই আমরা সেই হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত করছি। 'সুশাসন' উল্লিখিত ধারণাটিকে উভয় সংকট থেকে উত্তরণ করে সরকারকে একটি রাস্তা দেখায়, যা সরকারের নানা ধরনের কৌশলগত বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করে। (Balit, 1988)।

শাসন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কেউ কেউ এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সাথে সরকারের সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। অন্যরা গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর। আবার কেউ কেউ সরকারের ভূমিকা এবং দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সরকারের ওপর গুরুত্ব বেড়েছে আংশিকভাবে। কারণ বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা, এটা নিশ্চিত করতে দাতাদের এবং সাহায্য গ্রহণকারী দেশের সরকারের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে যাতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি সহায়তার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই বড় বড় করপোরেশনসহ অন্যান্য সমাজ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন ও সমাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (Bass and Rouse,1997) ।

যুক্তরাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রণীত 'হোয়াইট পেপার'-এ শাসনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

ক. মূল কার্যক্রম সম্পাদনের সামর্থ্য;
খ. নাগরিকের প্রত্যাশা এবং চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীলতা;
গ. নাগরিকের প্রতি জবাবদিহিতা।

একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সুশাসন নিহিত থাকে, যেখানে জনগণের সার্বিক চাহিদা ক্রমাগতভাবে ঐক্যভিত্তিক নীতির দিকে পরিচালিত হয়। সার্বিকভাবে রাজনীতিতে জনগণের যে চাহিদা, তা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করে।

সুশাসনের যে আলোচনা তা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ জনগণ সুশাসনকে গণতন্ত্রের সমার্থক বলেই মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নমুনা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনর্গঠনে বাইরের হস্তক্ষেপ ওই দেশের উন্নয়নে সীমিত সাফল্যই বয়ে আনছে- এটা মোটামুটি প্রমাণিত। যেহেতু এটা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ উপাদানকে না হলেও আংশিক পুনর্গঠন করেছে, তাই সমাজ বা রাষ্ট্রের আলোচনায় গভীরভাবে প্রোথিত হওয়া ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। (Elliot, 1994)।

যে কোনো সুশাসনের ধারণাই জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেখানে সামাজিক বিষয়াদি সরাসরি বিতর্ক, মতৈক্য বা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আইনের শাসনের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং নাগরিকরা নির্দিষ্ট সময় পরপর ভোটের মাধ্যমে তাদের মতামত দেয়। আসলে নাগরিকরা এই ভোটের মাধ্যমেই শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেয় শাসক এবং অভিজাতদের হাতে। কৌশলগতভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল সুশীল সমাজ এবং উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির সাথে সহাবস্থান করে। নাগরিকত্বের এই ধারণা নাগরিকদের বিস্তৃত ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা গণমাধ্যম ও তথ্যের প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর অর্থ হচ্ছে জনগণ স্থানীয় এবং বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম এবং তারা এ বিষয়ে সচেতন। (Balit, 2004)।

উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য 'সুশাসন' প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নয়। সমালোচকরা মনে করেন, এটা জনগণের সামর্থ্যের ওপর গুরুত্ব কম দিয়ে সরকারের ক্ষমতার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। সুশাসন বিষয়ে আলোচনা আন্তর্জাতিক শক্তি এবং ভারসাম্যহীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর মনোযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। (Abraham et al., 1990)। অন্য কথায়, অনুন্নত দেশের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকার ওপর পুরোপুরি গুরুত্ব না দিয়ে সমালোচকরা সুশাসনের নীতিকে ধনী দেশের সরকার কর্তৃক গরিব দেশের সরকারকে দোষী করার একটি উপায় হিসেবে মনে করে। তবে এটা সত্য যে, সুশাসনের ধারণাটি কৌশলগত দিক থেকে ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। যদিও এটা সরাসরি চ্যালেঞ্জিং কোনো বিষয় নয়। কারণ উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেরই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারণা আলাদা।

যাই হোক, কেউ কেউ সুশাসনের বিষয়টি পরিহার করতেই পারে। যার কারণ হিসেবে বলা যায়, সরকার নিজেই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং মানুষের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট। এটাকে আরো বিস্তারিতভাবে বললে, একটি রাষ্ট্রে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে, তা নাগরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এবং সুশাসন নিশ্চিত করে।

অন্যদিকে উন্নয়নের লক্ষ্য এবং কৌশলগত সক্ষমতা বিবেচনায় এবং মানবকল্যাণের জন্য কার্যকারিতা বিবেচনায় অনেকে সুশাসনের বিষয়টি বাদ দিয়ে দেয়। (Adhikarya, 1996)। আরো একটু বিস্তারিতভাবে বললে, রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি সরকারের জবাবদিহিতার ওপর নির্ভর করে, যা নাগরিকের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নে সক্ষম হয়, সুশাসন নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের জীবনযাপন করতে পারে। এটা রাজনৈতিক এমন একটি সিস্টেম তৈরি করতে সক্ষম, যা বিবেক-বুদ্ধি, সৌন্দর্য এবং উপস্থিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন নাগরিক তৈরি করে। এটা আইনের নীতিকে উন্নত করে। এটা বাণিজ্য, উৎপাদনে সক্ষম, ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, অর্থ উপার্জনের উপায় এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও ভালো। এর গুরুত্ব তুলে ধরা ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখন একটি কমিটি আছে। ২০০৬ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি'র বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, সুশাসনের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদন শতকরা ১.২ ভাগ ও পুঁজি চারগুণ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকও এই রকম একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে; অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা কার্যকরী ও জনমুখী সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ফলপ্রসূ উন্নয়ন তিনগুণ বৃদ্ধি করে। (Adhikarya et al., 2008)।

স্পষ্টত রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুশাসনের ধারণা বাস্তবায়ন করাটা খুবই কঠিন। প্রযুক্তি এবং যোগাযোগের অবাধ প্রবাহে প্রচুর বিনিয়োগ এবং আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ (যেটা তারা সহজেই করছে) ছাড়া সুশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি দিন দিন এটা আরো বেশি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে।

অতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত ছিল এবং অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপনের সীমা ছিল খুব ছোট পরিসরের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। স্থানীয় এবং সম্প্রদায়ে ঐতিহ্যগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনগণকে ব্যাপক তথ্য পাওয়ার সীমাকে ছোট করে দেয় আবার মাঝেমধ্যে সরকারের গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণও ব্যাপকভাবে জনগণকে তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। দেশ থেকে দেশে তথা বৈশ্বিকভাবে যোগাযোগপ্রবাহের সুযোগ বর্তমানে জনগণের সামনে তথ্য পাওয়ার অনেক পথ ও উৎস সৃষ্টি করেছে। এর অর্থ এই যে, এ সুযোগ জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আরো সুসংহত করে এবং একক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। আর এটা তথ্যসাপেক্ষ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (Balit, 1999)।

গণতন্ত্রে যে কোনো সরকারের প্রয়োজন নাগরিকদের সম্মতি এবং সমর্থন লাভ করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সমর্থন লাভের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের দ্বারা সরকার অপপ্রচার চালাবে। কিন্তু তথ্যের বিচ্ছুরণ, সমঝোতা তৈরি, গ্রহণযোগ্যতা এবং মালিকানার মধ্য দিয়ে জনগণের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব। নতুন প্রযুক্তি এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করেছে, যার ফলে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাবান কোনো মানুষই এককভাবে কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। (Boafo,1993)। যেমন, চীনের সরকার যদিও এখনো তাদের নাগরিকদের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবে তারাও যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুব বেশি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। সরকারের একটা পছন্দ আছে, আর এক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, নতুন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে। অথবা যেমন, ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট জোসেফ ইসত্রাদাকে (মোবাইল ফোনের মাধ্যমে 'স্মার্ট বোম' এর কারণে ২০০১ সালে তার সরকারের কার্যক্রম নড়বড়ে হয়ে যায়) নব্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সুশীল সমাজের একটি নতুন শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সরকারের উচিত তার নাগরিকের সাথে (এবং বহিরাগত নীতিনির্ধারকদের সাথে) ফলপ্রসূভাবে আলোচনা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই আরো বেশি যথার্থ, তীক্ষ্ণ, খোলামেলা এবং সক্রিয় কৌশলগতভাবে জনগণের দাবি-দাওয়া শোনার মানসিকতা, সাড়া প্রদান এবং জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। এটা সব রাজনৈতিক সিস্টেমের ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য। ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা দেন যে, জনগণের সাথে তিনি অনলাইন চ্যাটে থাকবেন। অন্যদিকে ভিয়েতনামের সরকারি ওয়েবসাইটের সম্পাদক ফাম ভিয়েট ডাং বলেছেন, অনলাইন ফোরাম আলোচিত বিষয়ে জনগণের উদ্বেগ এবং তাদের কথা শোনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে।

যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য তথ্য সরবরাহে সাহায্য করে

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যখন সেবা গ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া প্রদান এবং পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তখন সেটি আরো কার্যকর হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জনসেবার জন্য তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতে মোবাইল ব্যবহার, পাকিস্তানে সেবা ব্যবহারকারীদের অনলাইন অভিযোগ কেন্দ্র এবং ক্রোয়েশিয়াতে অনলাইন ওয়েটিং লিস্ট।

রাষ্ট্র সেবা প্রদান করুক কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা অথবা যৌথভাবে সেবা প্রদান করুক, সেটি অবশ্যই সাধারণ এবং গরিব জনগণের জন্য যথাযোগ্য হতে হবে। এই যথাযোগ্যতার মধ্যে পড়ে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে, চুক্তির ক্ষেত্রে, অর্থের জোগান এবং বাজেট তৈরিতে স্বচ্ছতা। (Boafo,1989)। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কী রকম সেবা দেয়া হবে, তা সেবা ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত হলে সেবার ধরন জনগণের অভ্যাস এবং অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খেয়ে যায়। ফলে বিশ্বস্ততা অর্জিত হয়। অনেকগুলো পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেবা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নাগরিক ও সেবা ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ যথার্থতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং দক্ষতা বাড়াতে পারে (যদিও আগে বলা হয়েছে, এই ধরনের স্বচ্ছতা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তেমন দেখা যায় না) । উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, মেক্সিকোর গালফে একটি পানির উৎস ব্যবস্থাপনায় ভিডিও'র মাধ্যমে পানি ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ সহজতর করার ফলে আগের পরিকল্পনা থেকে সাত শতাংশ বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। (Olivera, 1987)।

সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন যোগাযোগ, পর্যবেক্ষণ, প্রতিক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা এবং সেবা ব্যবহারকারীদের সক্রিয়তা। পরিসংখ্যানগত গবেষণা ও স্বাধীন মূল্যায়নের প্রভাব নিয়ে প্রকাশনা, নাগরিক রিপোর্ট কার্ড, তাৎক্ষণিক টেলিফোন ব্যবস্থা এবং স্বাধীন ন্যায়পাল সেবা ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনমতো ক্ষমতা এবং সুযোগ দিতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি সংস্থার সেবা জোগান ও অবলম্বন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করতে পারে, সাধারণ কাজের মধ্যে যেমন- নথি ব্যবস্থাপনা অথবা একটি মিটিং ডাকা আর একটি জটিল কাজের কথা বলতে গেলে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত নেয়া। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা খাতে আরো দক্ষতা বাড়াতে সরবরাহের একটি প্রবাহ তৈরি করতে পারে কিন্তু এটি শুধু উৎপাদন এবং বিক্রির জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি যেমন সরকারি ব্যয়ে জনগণের অংশগ্রহণ পদ্ধতি একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (Baskaran, 1990)।

এই অংশে আমরা দেখলাম, কীভাবে রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং ভালো শাসনতন্ত্র কার্যকরী যোগাযোগ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এবং চিহ্নিত হয়। স্বচ্ছতা, যথাযোগ্যতা এবং অংশগ্রহণ যোগাযোগ দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি যেমন তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উঠতি সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব

হচ্ছে উন্মুক্ত এবং প্রকৃত রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে বর্ধিত পর্যায়ের দায়িত্বশীলতা, যথাযোগ্যতা এবং সামর্থ্য।

দায়িত্বশীল নীতিনির্ধারক, দক্ষ সরকারি দায়িত্ব এবং সেবা প্রদান সুশীল সমাজের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে যেটি পারস্পরিক মতামতকে সমন্বিত করতে পারে। এটি তথ্য এবং যোগাযোগের ভূমিকা, প্রতিনিধিত্বশীল এবং শক্তিশালী সুশীল সমাজ উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে, যা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। (Byers,1996)।

পরিশেষ

বর্তমানে পৃথিবীতে লক্ষ-কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, যাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা বিশ্বের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সমসাময়িক কালে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে দারিদ্র্যকে বেশি প্রভাবিত করছে। সরকারি-বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি সমকালীন বিশ্ব বাস্তবতার নিরিখে এই ইস্যুগুলোকে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান নেই এটা ধরে নিয়েই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিতে হবে। আর এক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সহায়ক শক্তি হলো যোগাযোগ। পরিকল্পিত যোগাযোগের ব্যবহারই একমাত্র পারে দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠাতেথ যেমনটা বলেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। সেই সঙ্গে আরো যে বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার তা হলো: দেশের নীতিনীর্ধারকদের এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যা সমাজের ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য; সরকারকে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে হবে দল ও মতের বাইরে গিয়ে; টেকসই ও সঠিক মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাগবে এবং সুশীল সমাজকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী হওয়ার পরিবেশও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের এসডিজি ও আরো সুদূরপ্রসারী কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন পড়ে; সঠিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা এবং উন্মুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে যেখানে ব্যক্তি এককভাবে কিংবা সুশীল সমাজ সম্মিলিতভাবে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যাবে এবং সবাই একসঙ্গে কাজ করতে পারবে।

সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সমান্তরাল করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে বিশেষভাবে দরিদ্রদের অংশগ্রহণকে উৎসাহী করতে হবে এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। দ্রুত প্রতিযোগিতার জন্য যোগাযোগ জরুরি। নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের উন্নয়নে অংশগ্রহণকে সম্প্রসারিত করতে পারে। কিন্তু কৌশলগত সুযোগ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন তথ্যপ্রযুক্তি গরিব এবং ধনীদের উন্নয়নের জন্য সুযোগের পরিপূর্ণ সম্প্রসারণ করে। মুক্ত গণমাধ্যগুলো মানবজীবনে গতিশীলতা এবং উন্নয়নে সফলতা আনতে পারে। পরিকল্পিত যোগাযোগের জন্য অবশ্যই আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ফলে সমাজের মধ্যে সুশাসন ও মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হবে, যা প্রকারান্তে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যসূত্র

Abraham et al. 1990. Can media educate about the environment?, in *Media Development*, 2/1990, S. 6f

Abril, Olivera. 1987. How Groups Can Make, *A Group Communications Manual*, Manila.

Adhikarya et al. 1987, Motivating farmers for action. Howtrategic multi-media campaigns can help, Eschborn: GTZ.

Adhikarya R 1996, Participatory Environment Education through Agricultural Training: Best Practices and Lessons Learned from Six Asian Countries, paper to a GTZ International.

AIJ. 1983. Community Media, in: A Course Guide in Planningthe Use of Communication Technology, Manila.

and Communication Technologies, FAO, Rome.

Andand S. & Sen A.K. 1996. Sustainable human development: concepts and priorities,Discussion paper, Office of Development Studies, UNDP, New York.

Andand S. & Sen A.K. 1996. Sustainable human development: concepts and priorities, Discussion paper, Office of DevelopmentStudies, UNDP, New York.

Atkin, Meischke .1989. Family Planning Communication Campaigns in Developing Countries, in: Rice, Atkin (eds):Public Communication Campaigns, London, pp 227-232.

Balit S .1999. Voices for change - Rural women and Communication, Rome: FAO.

Balit S .2005. Communication for Isolated and Marginalized Groups. Blanding the old and the new. -Background paper of the IX UN Roundtable on Communication for Development,

Balit S .2015. Rethinking development support communication,in: dcr 3/2015, S. 7f.

Balit, S. 1999. Voices for change - Rural women and Communication, FAO, Rome

Balit, S.2004.Communication for Isolated and Marginalized Groups. Blanding the old and the new. Background paper of the IX UN Roundtable on Communication for Development, FAO

Baskaran. 1990. The rise of the environmental movement in India, in: Media Development, 2/1990, S. 13-16.

Bass, Stephan and John Rouse.1997. Poverty Alleviation: the Role of Rural Institutions and Participation, Land Reform, FAO, Rome

Berrigan. 1979.The Role of Community Communications, ParisBhasin U, Singhal A 1998, Participatory approaches to message design: a pioneering radio serial in India for adolescents, in Media Asia, 25/1, pp 12-18.

Boafo K. 1989. Communication and Culture: African perspective, Nairobi

Boafo K. 1993. Media and Environment in Africa, Nairobi: ACCE.

Bordenave. 1977.Communication and Rural Development, Paris.

Borrini G. 1991. Lessons Learned in Community-Based Environmental Management, Rome.

Borrini G. 1993. Enhancing People's Participation in the Tropical Forests Action Program, FAO, Rome.

Byers BA. 1996. Understanding and Influencing Behaviors in Conservation and Natural Reources Management, African Biodiversity Series, No. 4, Washington DC: USAID.

Cohen J. Uphoff N. 1980. Participation's place in rural development: seeking clarity through specific city, World Development 8: 213- 235.

Coldevin, G. 2005. Participatory Communication: a key to rural learning systems, FAO, Rome

Conference on 'Communicating the Environment', Bonn, Germany: Dec. 15-19.

ECOSOC. 2003. Promoting an Integrated Approach to Rural Development in Developing Countries for Poverty Eradication and Sustainable Development.

Elliot, J. 1994. An Introduction to Sustainable Development, London: Routledge, pp.4-5.

Environment Institute, Working paper 00-04, Tufts University, Medford.

Girard, B. 2005. The one to watch: Radio, new ICTs and interactivity, FAO, Rome.

Harris J.M. 2000. Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and

Hovland, I. 2005. Successful Communication: A Toolkit for Researchers and Civil Society Organisations, ODI, UK.

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রা.বি

উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রাথমিক ধারণা

আরশাদ সিদ্দিকী

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হননুলুতে ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারে আয়োজিত এক সেমিনারে। ১৯৬৮ সালে ফিলিপাইনে থমসন ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইকোনমিক রাইটারস ট্রেনিং কোর্স চলাকালে অ্যালান চাকলে এবং জুয়ান মার্কেডো প্রথমবার 'উন্নয়ন সাংবাদিক' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন।

চাকলে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, 'একজন সাংবাদিকের প্রধান কাজ হলো পাঠককে তথ্য দেয়ার মাধ্যমে তাকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। তার দ্বিতীয় কাজ হলো, সংঘটিত ঘটনা বাস্তব একটি

বাস্তব উন্নয়ন সাংবাদিকতার এ সংজ্ঞা পরিপূর্ণ নয়। উন্নয়ন সাংবাদিকতার অনুশীলনকারী ও সাংবাদিকতার পণ্ডিতজনেরা নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন

কাঠামোর মধ্যে পরিবেশন করা, সম্ভব হলে তার ব্যাখ্যা দেয়া। তৃতীয় কাজ হলো, শুধু সমস্যার দিকগুলো নয়, ইতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরা। সেই সাথে পাঠককে সমস্যা সমাধানের দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দেয়া।'

বাস্তব উন্নয়ন সাংবাদিকতার এ সংজ্ঞা পরিপূর্ণ নয়। উন্নয়ন সাংবাদিকতার অনুশীলনকারী ও সাংবাদিকতার পণ্ডিতজনেরা নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। উন্নয়ন সাংবাদিকতা সম্পর্কে চাকলে আরও বলেন, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা অভিজাতদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জন্য। তাই উন্নয়ন সাংবাদিকদের উচিত সহজ শব্দ ব্যবহারের প্রতি নজর দেয়া এবং পরিভাষা এড়িয়ে সংবাদ পরিবেশন করা'।

শেলটন গুররত্নে ১৯৭৮ সালে উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নয়ন সাংবাদিকতা 'বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা, সূক্ষ্ম তদন্ত, গঠনমূলক সমালোচনা এবং তৃণমূলের (প্রকৃতপক্ষে অভিজাতদের তুলনায়) সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা প্রথাগত সাংবাদিকতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা গণমাধ্যমকে তথ্য ও বিনোদন প্রদান এবং কর্তৃত্ববাদী করে তোলে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতাসীনদের সমালোচনায় উৎসাহী করে এবং ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেয়'।

নারিন্দ্র আগারওয়াল ১৯৭৮ সালে উল্লেখ করেন, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা জাতীয় এবং স্থানীয় চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। পশ্চিমের সমালোচকরা যাকে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ বলে ব্যাখ্যা করছে।' তাঁর যুক্তি হলো, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা, পরিকল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা, প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব, প্রকল্পের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং প্রকল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।'

ফেয়ার জে ই ১৯৮৮ সালে ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোনো দেশের জনসংখ্যার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃণমূলের প্রয়োজনীয়তার সাথে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি সম্পর্কিত। উন্নয়ন সাংবাদিকতা দেশের জনগণের চাহিদা পূরণ এবং আত্মনির্ভরতাতে অবদান রাখে এমন সংবাদ পরিবেশন করে। এসব সংবাদ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অথবা উন্নয়ন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত।'

উন্নয়ন সাংবাদিকতা সম্পর্কে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সমসাময়িক পণ্ডিতদের অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের অনেকেই উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে প্রচারমূলক ও কর্তৃত্ববাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুত্ব নাকচ করে বলেছেন, সাংবাদিকতার এ ধারণা কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে আবদ্ধ। তারা আরও বলছেন, উন্নয়নশীল সাংবাদিকতা বিকল্প সংবাদমাধ্যম ইন্টার প্রেস সার্ভিস, ডেপথ নিউজ, জেমিনি এবং সাউথ-নর্থ নিউজের মতো সংবাদমাধ্যমে সীমাবদ্ধ।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও এ কথা বলা যায়, উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি গঠনমূলক এবং কার্যকর, কিন্তু দুঃখজনকভাবে এটি নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন অর্ডারের সাথে তিক্ত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। উন্নয়ন সাংবাদিকতা গণতন্ত্র, নিরাপত্তা, শান্তি ও মানবিক নীতিসমূহ বাস্তবায়নে উপযোগী। একই সাথে সমাজের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের উপায়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ইতিবাচক দিকগুলোকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য আমরা জোহান গ্যালটং এবং রিচার্ড ভিনসেন্টের ১০টি প্রস্তাবনা বিবেচনা করে দেখতে পারি। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত গ্যালটং ও ভিনসেন্টের ১০টি প্রস্তাবনা হলো:

১. উন্নয়ন সাংবাদিকতা সাংবাদিককে 'জনস্বার্থে'র সাথে সম্পর্কিত করে। কারণ সাংবাদিকরাই সাধারণ মানুষের মানবিক চাহিদার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি, জাতি পরিচয়ভেদে সাধারণ মানুষের কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে।

২. উন্নয়ন গণমাধ্যমে শুধু অর্থনীতি নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষার দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করে। উন্নয়ন সাংবাদিকদের প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে সাহিত্যের অনুরূপ।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিসংখ্যান যে তথ্যগুলো সচরাচর সাংবাদিকেরা এড়িয়ে যান, উন্নয়ন সাংবাদিক সে দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমন-আয়ের বিবেচনায় নিচের দিকের ১০% মানুষের কথা উন্নয়ন সাংবাদিকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করেন।

৪. উন্নয়ন সাংবাদিকরা সম্পর্কের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তারা ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে শুধু পার্থক্য নয়, সম্পর্কের দিকটিও বিবেচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন দরিদ্র মানুষের মজুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে; কিন্তু বাজারমূল্য তাতে কমে যায় না। এ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন সাংবাদিকরা তাদের বাঁচার বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করেন।

৫. একটি উন্নয়নভিত্তিক গণমাধ্যম বিশেষ পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে। এর অর্থ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

৬. উন্নয়ন সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের বহুমাত্রিকতাকে কখনোই উপেক্ষা করে না। গণমাধ্যমের কর্মসূচি হলো এই যে, সিস্টেমটি কী করছে তা জানাতে হয়। মানুষ, সিস্টেম এবং গণমাধ্যমের মধ্যে তথ্য সরবরাহের একটি প্রবাহ থাকলে গণতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

৭. উন্নয়ন প্রতিবেদন মানে সমালোচনা বা কেবল সমস্যা তুলে ধরা নয়, বরং ইতিবাচক কর্মসূচির গঠনমূলক দিকগুলো তুলে ধরে। উন্নয়ন সাংবাদিকরা এমন সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরেন, যা সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয় এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথকে গতিশীল করে।

৮. 'মানুষকে' কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। এর অর্থ জনগণের একটি কণ্ঠ তৈরি করা। উন্নয়ন সাংবাদিকতার একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের আলোচনা করা। যাতে জনগণের 'দৃষ্টিভঙ্গির বিশাল পরিসীমা' পরিব্যাপ্ত হয়।

৯. এক ধাপ এগিয়ে জনগণকে গণমাধ্যমের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দেয়া। মানুষকে সংবাদ বা সম্প্রচার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া।

১০. জনপ্রিয় আন্দোলনগুলো সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট করা– যেখানে কেবল তাদের সাফল্যের নয়, তাদের ব্যর্থতারও যেন প্রতিফলিন হয়।

66

উন্নয়ন সাংবাদিকতা সাংবাদিককে 'জনস্বার্থে'র সাথে সম্পর্কিত করে। কারণ সাংবাদিকরাই সাধারণ মানুষের মানবিক চাহিদার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি, জাতি পরিচয়ভেদে সাধারণ মানুষের কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে।

99

সাংবাদিকতার প্রচলিত ঘরানায় উন্নয়ন সাংবাদিকতা একটি নবীন ধারণা। সংবাদ সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যার জন্য একটি কাঠামো। মানুষ তাদের জীবন এবং লব্ধ সুযোগ-সহায়তা ব্যবহার করে কতখানি উপকৃত হচ্ছেন তা তুলে ধরা। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বর্তমান এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ তার উপলব্ধ সুযোগ সম্পর্কে অজ্ঞাত। ফলস্বরূপ, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার জঘন্য চক্র অব্যাহত রয়েছে। তাই তথ্য প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্বও উন্নয়ন সাংবাদিকতার ওপর বর্তায়।

লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

আমাদের সময়ে মেয়ে ফটোগ্রাফার বলতে শুধু আমিই ছিলাম

——— সাইদা খানম

শুরুটা কৈশোর বয়সে। এ বয়সে বই ও পুতুলখেলায় সময় বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি এই সময়ে হাতে তুলে নিলেন ক্যামেরা। বলা হচ্ছে সাইদা খানমের কথা, যিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী।

আলোকচিত্রী সাইদা খানম পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর। অবিভক্ত ভারতের সেই সময় এবং তারপর পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশের পথপরিক্রমায় স্থিরচিত্রী হিসেবে আমাদের ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল তিনি কেবল প্রথম নন, ছিলেন একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নারী আলোকচিত্রী।

মেয়েদের তখন ঘোড়ার গাড়ির বদ্ধ ঘেরাটোপে স্কুল-কলেজে যেতে হতো। সেই সময় সাইদা খানম ক্যামেরা হাতে শহরের অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন

ফটোগ্রাফি নিয়ে এমনই কিছু অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম। ক্যামেরা হাতে ছবি তুলে বেড়াতেন যখন, তখন ঢাকা শহরে কোনো মেয়ের জন্য আলোকচিত্রী হওয়াটা ছিল বেশ কঠিন। মেয়েদের তখন ঘোড়ার গাড়ির বদ্ধ ঘেরাটোপে স্কুল-কলেজে যেতে হতো। সেই সময় সাইদা খানম ক্যামেরা হাতে শহরের অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন। একটা অন্ধকার যুগকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসাটা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। সাইদা খানম যে সময় ছবি তোলা শুরু করেছিলেন, তখন সমাজ ছিল অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

একজন আলোকচিত্র সাংবাদিক হিসেবে সাইদা খানম দীর্ঘদিন কাজ করেন 'বেগম' পত্রিকায়। কাজ করেন প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবেও। তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিট্রেনের রানী এলিজাবেথ, জাপানের রানী মাদার তেরেসা, সত্যজিৎ রায়, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান এবং চাঁদের প্রথম পদার্পণকারী তিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্সকে।

এছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের ওপর তিনবার একক ছবি প্রদর্শিত হয় সাইদা খানমের। এই কীর্তিময়ী পাবনার অত্যন্ত শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারে বেড়ে উঠেন। সাইদা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও লাইব্রেরি

সায়েন্সে এমএ পাস করেন। ব্যতিক্রমী এই কাজকে তিনি প্রথমদিকে নেশা এবং পরে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। আলোকচিত্রী সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ছবি ছাপা হয় 'বেগম', 'অবজারভার', 'মর্নিং নিউজ', 'ইত্তেফাক' এবং 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন পত্রিকায়। আলোকচিত্রী হিসেবেও দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন তিনি।

১৯৫৬ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রর্দশনীতে অংশ নেন সাইদা খানম। ওই বছরই জার্মানিতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কোলনে পুরস্কার পান তিনি। এরপরই বাংলাদেশে আলোচনায় আসেন। এরপর ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, পাকিস্তান, সাইপ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে 'অল ইন্ডিয়া ফটোজার্নালিজম কনফারেন্স' এ কলকাতায় যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে 'বেগম' পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৮০ সালে দিল্লিতে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স' কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র কনফারেন্সে যোগাদান করেন। ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ডি.পি.আই এনজিওর ৫২তম সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৯৭ সালে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একক প্রদর্শনী, 'জয়নুল আর্ট গ্যালারি' ১৯৯৭ সালে মাদার তেরেসার একক প্রদর্শনী 'মহিলা সমিতি', ২০০০ সালে শান্তিনিকেতন ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লাইব্রেরি ২০০১ সালে কলকাতায় নন্দনে সত্যজিৎ রায়ের ওপরে বিশ্ববিখ্যাত সরোদবাদক ও সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁনের ছবি তুলেছেন দীর্ঘ সময়। সুরসম্রাট তাকে প্রায়ই চিঠি লেখতেন।

সাইদা খানম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবি তুলেছেন। তিনি যখন বিদ্রোহী কবির ছবি তুলেছিলেন, তখন কবির মুখে ভাষা নেই। পাইকপাড়া ছোট একটি ফ্ল্যাটে স্ত্রী প্রমীলা দেবীর সঙ্গে থাকতেন কবি। একদিন কবির বাসায় গিয়ে দেখতে পান জানালার একপাশে বিছানায় কবি বসে আছেন। আরেকটা বিছানায় অর্ধশায়িত প্রমিলা দেবী, এই দৃশ্য তার মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়।

শান্তি নিকেতনে গিয়ে চিত্রশিল্পী নন্দনাল বসুরও ছবি তুলেছেন সাইদা খানম। এছাড়া মহানায়ক উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, অরুন্ধতী মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সাম্যাল, বিকাশ রায়, চন্দ্রাবতী দেবী, ছায়াদেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমানসহ অসংখ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করেন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী। সম্প্রতি ফটোগ্রাফি শিল্পের সেকাল-একাল নিয়ে কথা বলেন সাংবাদিক **মো. কবির হোসেন কাব্য**'র সঙ্গে।

প্রশ্নঃ আপনি তো বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী। পঞ্চাশের দশকে একা একজন মেয়ে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিষয়টি নিশ্চয়ই সহজ ছিল না?

সাইদা খানমঃ আমাদের সময় মেয়ে ফটোগ্রাফার বলতে শুধু আমিই ছিলাম। এমন কোথাও গেলে ক্যামেরা হাতে দেখলে আমার দিকে তাকিয়ে লোকে অবাক হয়ে যেতেন। কারণ এতো ছেলে ফটোগ্রাফারের মাঝে আমিই ছিলাম শুধু মেয়ে। আমার পিতার আদিবাড়ি ফরিদপুর হলেও পাবনায় নানা বাড়িতে বেড়ে ওঠা। ওখানেই জন্ম। নানা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলাইমান মেয়েদের শিক্ষা প্রগতির ব্যাপারে কাজ করতেন আর আমার খালা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ছিলেন তখনকার দিনে প্রখ্যাত কবি। ভীষণ উদারমনা মানুষ ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় আমি প্রায় অসুস্থ থাকতাম। তখন দোতলায় একটি ঘর ছিল আমার বিশ্রাম কক্ষ। জানালা দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে পরিবর্তন আর পাখিদের আনাগোনা দেখে দেখে সময় কাটত। মনে হতো, প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য আমি কীভাবে ধরে রাখতে পারব।

প্রশ্নঃ এই দৃশ্যগুলো ধরে রাখার জন্যই কি ওইসময় ছবি তোলা শুরু করলেন?

সাইদা খানমঃ আমার নানা হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক তাকে হাওয়া বদলের কথা বললেন। নানাকে নিয়ে সপরিবারে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই। এর মধ্যে কয়েক বছর আমরা গিরিডিতে ছিলাম। এখানেই বালিকা থেকে কিশোরী অবস্থায় পা রাখলাম।

মেট্রিক পরীক্ষার আগের কথা। কলকাতায় 'লাইফ' বলে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। গ্যালারিতে ঘুরছি। মুগ্ধ হয়ে একের পর

এক ছবির সামনে দাঁড়াচ্ছি। ছবি দেখতে দেখতে আমি অনুভব করি, মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা– এ বিষয়গুলো আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরায় যে শিল্পবোধ ফুটে উঠেছে, তা অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

প্রশ্নঃ তারপর থেকেই কি ক্যামেরা হাতে নিলেন?

সাইদা খানমঃ আমার সঙ্গে ছিলেন পারিবারিক বন্ধু প্রবাল ঘোষ ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা। ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের। প্রবালের আপত্তি আলোকচিত্রের যে আর্ট, এ বিষয়টা স্বীকার করা। আমরা কথা বলতে বলতে রীতিমতো তর্কে লিপ্ত হলাম। আমি ওকে বলেছিলাম 'ফটোগ্রাফি যে একটা শিল্প, তা আমি ছবি তোলার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেব।'

প্রশ্নঃ শুনেছি কাবুলিওয়ালার ছবিটি প্রথম তুলেছিলেন আপনি সেই গল্পটা বলুন।

সাইদা খানমঃ আমার বয়স তখন ১৩ বা ১৪ হবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দুইজন কাবুলিওয়ালা দেখে ওদের ছবি তুলি। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা পড়ে চরিত্রটি ঘিরে ভীষণ আগ্রহ জন্মায়, একটা ভালোলাগাও ছিল। কিন্তু ছবি তোলায় ওরা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমি একটু ঘাবড়ে যাই, তবে ট্রামের হুইসেল বেজে ওঠায় ওরা সেইদিকে চলে যায়। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বক্স ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে তুলতে মনে হলো, ছবিতে যে জিনিসটা আমি চাইছি, তা ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। তখন আমি কারো কাছে ভালো কোনো ক্যামেরা দেখলে বলতাম তোমার ক্যামেরাটা একটু দেবে? অনেকেই দিয়েছিল আবার অনেকে দেয়নি। এ নিয়ে একদিন খুব মনোমালিন্য হয় একজনের সঙ্গে। মেজো আপা হামিদা খানম তখন পড়াশোনা করতে আমেরিকা যাচ্ছেন, তিনি দেশে ফেরার সময় আমার জন্য 'রোলিকড' ক্যামেরা নিয়ে আসেন। সেদিন আপা ক্যামেরা না এনে দিলে বোধহয় আমি কোনোদিন আলোকচিত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না।

প্রতিবেদকঃ সে সময় ঢাকায় কীভাবে আপনার ফিল্মগুলো ডেভেলপ করতেন?

সাইদা খানমঃ মাত্র দুইটি স্টুডিও ছিল। ডাস ও জায়েদ স্টুডিও। আমি যেতাম জায়েদ স্টুডিওতে ফিল্ম ওয়াশ করাতে। স্টুডিওর লোকটি আমার ছবির কম্পোজিট দেখে মুগ্ধ হয়ে জার্মানি, আমেরিকা থেকে বের হতো এমন ম্যাগাজিন দিয়ে বললেন, 'এখানে ছবির নিচে যে অ্যাপারচার ও এক্সপোজার লেখা থাকে, তা তুমি ভালো করে দেখবে এবং ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন হবে।' ওটাই ছিল আমার শিক্ষালাভ। এখনকার দিনে ফটোগ্রাফি শিক্ষার জন্য বহু রকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে, হাজারো স্টুডিও রয়েছে, আমাদের সময় ছবি তোলা শেখানোর জন্য কিছুই ছিল না।

প্রশ্নঃ আপনি তো বেগম পত্রিকার জন্য ছবি তুলেছেন?

সাইদা খানমঃ বেগম পত্রিকার সঙ্গে আমি ১৯৫৬ সালে যুক্ত হই। সেই সময় আমার একটা ছবি জার্মানি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কোলনে প্রতিযোগিতায় জমা পড়ে। সেখানে আমি একটি পুরস্কার পাই। এটাই ছিল আলোকচিত্রে আমার প্রথম পুরস্কার। আমার খালা কবি মাহমুদা খাতুন আমাকে বেগম অফিসে নিয়ে যান। সওগাতের সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন যখন শুনলেন আমি ছবি তুলি, চাচা খুব খুশি হলেন এবং বললেন, তুমি বেগমের প্রচ্ছদের জন্য ছবি তুলবে। পাশাপাশি মেয়েদের বিভিন্ন কাজকর্ম, সভা-সমিতি, খেলাধুলার ছবি তুলে দেবে। এভাবেই বেগমের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা।

প্রশ্নঃ তখনকার দিনে একজন মেয়ে হিসেবে ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া, মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

সাইদা খানমঃ ঢাকা ছিল তখন একটা মফস্বল শহরের মতো। মেয়েরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে স্কুল-কলেজে যেত। সেই সময় আমি ক্যামেরা নিয়ে সারা ঢাকা ঘুরে বেড়িয়েছি। ছবি তুলতে কখনো গ্রামগঞ্জে, নদীর ধারে গিয়েছি। সে সময় এটা খুব সহজ ছিল না। মানুষের বাঁকা চাহনি, যা তা শোনা, ঢিলও ছুঁড়েছে, তবে থেমে যাইনি। এসব কথা বাড়িতে বলতাম না। তুমি শুরুতে আমার পরিবার নিয়ে জানতে চাইছিলে। আমার পরিবার ছিল অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা এবং প্রগতিশীল। আমার মা, খালা ভীষণ প্রগতিশীল ছিলেন। তারা কখনো আমাকে বাধা দেননি। তবে বাবা বলতেন তুমি দুটি জায়গায় ছবি তুলতে যাবে না। একটা হলো বিয়ের মজলিস অন্যটি স্টেডিয়াম।

প্রশ্নঃ বেগমের জন্য তো খেলার ছবি তুলতে হতো আপনাকে?

সাইদা খানমঃ হ্যাঁ, বাবার না বলা দুটি জায়গার মধ্যে একটাতে যেতে হয়েছে আমাকে। স্টেডিয়ামে মেয়েদের বিভিন্ন খেলার ছবি তুললাম। তবে বেগমের প্রচ্ছদের জন্য কাঁধখোলা ভেজা চুলের যে ছবিটি তুলেছিলাম, তা নিয়ে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আমাদের বাড়ির সামনে এসে অনেকে প্রতিবাদও জানায়। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে এশিয়া গেমসে বেগমের হয়ে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। 'বেগম' ছাড়াও তখনকার দিনে যেসব খবরের কাগজ বের হতো, যেমন- অবজারভার, মর্নিং নিউজ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, এসব পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হতো।

প্রশ্নঃ রানী এলিজাবেথ ঢাকায় এলে আপনি তার ছবি তুলেছিলেন কি?

সাইদা খানমঃ হ্যাঁ। রানী এলিজাবেথের ঢাকায় আসার খবরে ছবি তোলার জন্য আমি খুব ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বেগম পত্রিকার সম্পাদনা করতেন নূরজাহান বেগম, ভীষণ আদর করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। বললেন, আমাদের তো কোনো ক্ষমতা নেই, তোমাকে ছবি তোলার অনুমতি জুটিয়ে দিতে পারছি না, তবে তুমি চেষ্টা করে দেখ পারবে কিনা। আমি তখন সচিবালয়ে যোগাযোগ শুরু করলাম। দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন না। বলেছিল, 'দেখি কী করা যায়?' দিন যাচ্ছে আর আমার চিন্তাও বাড়ছে। মনে আছে, রানী আসার আগে আমি প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে কার্ডটা পেলাম। কী যে আনন্দ লেগেছিল এটি পেয়ে, ভীষণ গর্ব হয়েছিল।

প্রশ্নঃ 'স্মৃতির পথ বেয়ে' আপনার আত্মজীবনী বইয়ে সেদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ আছে, তবু গল্পটা আপনার মুখে শুনতে চাই।

সাইদা খানমঃ আমি তখন শাড়ি পরতাম। সেদিন এয়ারপোর্টে শাড়ি পরে গিয়েছিলাম। পৌঁছে মনে হয়েছিল ওখানে ২০০'র বেশি আলোচিত্রীর মধ্যে আমি একমাত্র বাঙালি মেয়ে। সঙ্গে দুইটি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছি। রানী যখন প্লেন থেকে নামলেন, তখন সবার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল কিন্তু আমার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ কাজ করল না। সেই মুহূর্তে মনে হলো এটা কী ঘটে গেল? বুদ্ধি করে সঙ্গে রাখা অন্য ক্যামেরাটায় হাইস্পিডে ফ্লিম লোড করে খুব দ্রুত ছবি তুলতে থাকলাম। খুব সুন্দর কিছু ছবি পেয়েছিলাম সেদিন। পরে রানী যখন আদমজী জুট মিল পরিদর্শনে গেলেন, তখন খুব কাছ থেকে তাকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি তাকে অভিবাদন জানালে তিনি হেসেছিলেন, এখনো মনে পড়ে।

প্রশ্নঃ 'চিত্রালী'তে তো আপনি কাজ করেছেন?

সাইদা খানমঃ হ্যাঁ। বেগম ছাড়াও চিত্রালীতে কাজ করেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ দুর্বল ছিলাম। তাই বছরে একবার কলকাতায় যেতাম শারীরিক চেকআপের জন্য। ডাক্তারি চেকআপ শেষে কলকাতায় সিনেমা স্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতাম। নির্মল কুমার ঘোষ ছিলেন সেসময় গুণী সমালোচক। তিনি আমাকে চিত্রতারকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দিতেন। নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে 'শিউলী বাড়ী'-এর শুটিং হচ্ছিল। বিজন বিহারীর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন উত্তম কুমার। আমি তার ছবি তুলেছিলাম। চিত্রালীর পাশাপাশি বেগম পত্রিকায় তা ছাপা হয়। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী স্যানাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধুবী মুখার্জিসহ অনেক তারকার ছবি তুলেছিলাম। আর মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বাড়ি ছিল আমাদের পাবনার পাশের বাড়ি। আমরা ওকে রমা বলতাম। রমা আমার ছোটবেলার খেলার সাথী ছিল। পাবনা থাকলেও শান্তি নিকেতনে পড়তে যায় রমা। পরে যখন ফিরে আসে– দেখলাম, রমা অপরূপ সুন্দরী হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে কলকাতার স্টুডিওতে নায়িকা সুচিত্রার সাথে আমার দেখা হয়েছে। ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি।

প্রশ্নঃ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সঙ্গে তো আপনার ঢাকায় পরিচয়?

সাইদা খানমঃ তিনি তাঁর মায়ের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, গ্রামে স্কুল-কলেজ করে দেবেন। সেজন্য ঢাকায় আসেন। বর্ধমান হাউস এখন যেটা বাংলা একাডেমি, সেখানে থাকতেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান। অনেকেই আসতেন। আসর চলত। আমি যেতাম বেগমের জন্য ইন্টারভিউ নিতে। তিনি আমাকে কেন যেন খুব স্নেহ করতেন। বলতেন, আমার সঙ্গে মাইহারে চল। তোমাকে সরৎ দেখাব। তখন আমরা জয়নগরে থাকি। একদিন সাহস করে আমাদের বাড়িতে তাকে দাওয়াত দিলাম। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। সকাল থেকে

বাড়িতে নানা রকম খাবারের রান্না হলো, কিন্তু সেদিন খুব বৃষ্টি হয়ে হাঁটুপানি জমে যায় আমাদের বাড়ির সামনে। তাকে আর আনতে যেতে পারিনি। টেলিফোন না থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরের দিন সকালে আমি খাবার নিয়ে বর্ধমান হাউসে যাই। খুব রেগে ছিলেন। আমি যখন টেবিলে খাবারগুলো রাখতে শুরু করলাম, তিনি বললেন খাবারগুলো নিয়ে যাও, না হলে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। চোখ মুছতে মুছতে আমি বর্ধমান হাউস থেকে বেরিয়ে আসি। সেদিন থেকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিখ্যাত মানুষের ইন্টারভিউ নিতে যাব না। এক বছর পর কলকাতায় গড়ের মাঠে গিয়েছি। সেদিন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ওস্তাদ আলাউদ্দীন বাজাবেন। তখন গ্রিন রুমে একটা স্লিপ পাঠালাম আমার নাম লিখে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি মনে মনে ভাবতাম, কবে আবার তোমার সাথে দেখা হবে?'

প্রশ্নঃ চিত্রালী পত্রিকার হয়ে সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এর পরের ঘটনা ইতিহাস। দীর্ঘদিন সত্যজিৎ রায়ের ছবি তুলেছেন শুনেছি। তার স্ত্রী বিজয় রায়ের সঙ্গে আপনার সুসম্পর্কও ছিল।

সাইদা খানমঃ আমার মনে হয়, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলা। আমি ৩০ বছর ধরে ছবিগুলো তুলেছি। তাঁর মৃত্যুর পরে ঢাকায় দুইবার এবং কলকাতায় নন্দনে একবার ছবিগুলো নিয়ে এক্সিবিশন করেছি। মানিকদার ওই ছবিগুলো দর্শক খুব পছন্দ করেছিল। একজন মন্তব্যের বইয়ে লিখেছিলেন এতদিন সত্যজিৎ রায়ের কাজকর্মের ছবি দেখেছি, কিন্তু এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর পারিবারিক জীবনের চিত্র খুঁজে পেলাম।

প্রথমবার যখন সত্যজিৎ রায়ের ইন্টারভিউ নিতে যাই, আমাকে সবাই খুব হতাশ করেছিল। বলেছিলেন তিনি খুব দাম্ভিক মানুষ, অহংকারী, কথা কম বলেন, তোমাকে হয়তো ইন্টারভিউ করার সুযোগ দেবেন না। আমি কারো কথা শুনিনি। ভেবেছি, যে মানুষটা 'পথের পাঁচালি' বানিয়েছেন, তিনি প্রচণ্ড মানব দরদি, দাম্ভিক কেন হবেন!

আমি ফোন করলে দুই দিন পর যেতে বলেন আমাকে। তিনি তখন থাকতেন লেক টেম্পল রোডে। সন্ধ্যার একটু আগে আমি গিয়েছিলাম। বাড়িটি ছিল তিন তলা। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি, তিনি বসে লিখছেন। আমার মনে হচ্ছিল, এই মানুষটা পৃথিবীর একজন বিখ্যাত পরিচালক, বড় মাপের ঝানু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার। যাঁর সাক্ষাৎকার এবং ছবি তুলতে এসেছি, তার তুলনায় আমি অতি নগণ্য। সে মুহূর্তে মনে হলো আমি বরং ফিরে যাই, ছবি তুলব না। কিন্তু তিনি আমার উপস্থিতি টের পেলেন, আমাকে ভেতরে আসতে বললেন। আবার লেখার মধ্যে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন, আমি কিছুই বুঝলাম না। এরপর ভীষণ বিনয়ের সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমার সম্পর্কে কী জানতে চান?'

প্রশ্নঃ আপনি কী উত্তর দিয়েছিলেন?

সাইদা খানমঃ আমার জন্য ছিল এটা বিরাট একটা প্রশ্ন। তিনি তখন সদ্য 'কাঞ্চন জংঘা' ছবিটির শুটিং শেষ করে দার্জেলিং থেকে ফিরেছেন। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, কাঞ্চন জংঘার ছবিটি সম্পর্কে আমি এখনো কিছু জানি না। এ ছবির কাহিনী আর অভিনয়শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু বলেন। তিনি যখন বলতে শুরু করলেন, সে কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রশ্ন করতে লাগলাম। এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, ঢাকা সম্পর্কে বললেন, ঢাকার ছবি কেমন হচ্ছে? আমি বলেছিলাম, ভালো ছবি করার চেষ্টা চলছে। তিনি ঢাকার স্মৃতিচারণ করে বললেন, ছেলেবেলায় আমি একবার ঢাকায় গিয়েছিলাম, স্টিমারে ফিরছি, স্টিমার তখন মাঝ পদ্মায়। আমার খুব মনে পড়ে, মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে সূর্যাস্ত দেখিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ সেবার কোনো ছবি তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের?

সাইদা খানমঃ তাঁর কথা শেষ হলে আমি ছবি তোলার কথা বললে তিনি ভীষণ খুশি হলেন। বললেন, আমাদের দেশে মেয়েরা এ লাইনে একেবারে এগিয়ে আসে না। তারপর আমি যেই ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তুলেছি, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়া রায় ছুটে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো কোনো অঘটন ঘটেছে। যখন দেখলেন, আমি ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি হেসে ফেললেন। তিনি আমাকে চা নাশতা খাওয়ালেন। বললেন, তুমি যখন ঢাকা থেকে আসবে, সরাসরি আমাদের বাসায় চলে আসবে। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এরপর থেকে কোনোদিন আমি অ্যাপায়মেন্ট নিয়ে যাইনি। আমি সত্যজিৎ রায়কে 'মানিকদা' বলতাম।

প্রশ্নঃ সত্যজিৎ রায় আপনাকে একটা নাম দিয়েছিল। কী নামে ডাকতেন তিনি?

সাইদা খানমঃ তিনি আমাকে বাদল বলে ডাকতেন। এরপর যতবারই আমি তার বাড়ি গিয়েছি, মানিকদা নিজে এসে দরজা খুলে দিতেন এবং খুব খুশি হতেন আমাকে দেখে। আমি প্রতিবছর একবার করে কলকাতায় যেতাম। তার মহানগর, চারুলতা এবং কালপুরুষ এবং মহাপুরুষ সিনেমার শুটিংয়ের সময় উপস্থিত থেকে ছবি তুলেছিলাম।

প্রশ্নঃ সত্যজিৎ রায় শুটিংয়ের সময় ছবি তোলার অনুমতি দিতেন?

সাইদা খানমঃ 'চারুলতা' শুটিংয়ের সময় অন্য কোনো রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফারকে অনুমতি দেননি। শুধু আমাকে এবং একজন বিট্রিশ শিল্পীকে অনুমতি দিয়েছিলেন। যখন-তখন আমরা ছবি তুলতে পারতাম। পরবর্তী সময়ে মানিকদার পরিবারের কাছের মানুষ হয়ে উঠি আমি। অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছি। মানিকদা শেষবার অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে, কাউকে চিনতে পারতেন না, তখন বাইরের কাউকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হতো না। আমি বিজয়া রায়কে মক্কুদি বলে ডাকতাম, বললাম আমি কি একবার মানিকদাকে দেখতে পারি? তিনি আমাকে বললেন, সকালে আমাদের বাড়িতে এসো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। পথে আসতে আসতে বিজয়াদি আমাকে বললেন, দেখ বাদল তিনি অনেককেই চিনতে পারেননি। উনার অনেক নিকট বন্ধুকেও চিনতে পারছেন না। তোমাকে যদি চিনতে না পারে, তুমি মন খারাপ করতে পার। হাসপাতালে যখন তাঁর কেবিনে গেলাম, চারপাশের অনেক যন্ত্রপাতি মেশিন বসানো, এসব দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। মক্কুদি বললেন, দেখ বাদল এসেছে। মানিকদা আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন, বাদল ভালো আছ? তখন আমি তাঁর হাতটা ধরলাম, খুব ঠাণ্ডা ছিল হাতটা।

প্রশ্নঃ আপনার দৃষ্টিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন কেমন ব্যক্তি ছিলেন?

সাইদা খানমঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ছিলেন খুব আন্তরিক। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি ছিল খুব মনোমুগ্ধকর। আমি প্রায়ই ক্যামেরা নিয়ে জয়নুল আবেদীনের বাসায় যেতাম তাঁর কিছু ছবি তোলার আশায়।

প্রশ্নঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলুন?

সাইদা খানঃ ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি আর্মির ছবি তুলতে গিয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়। আমি আমার পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে শেরাটনের চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম, ক্যামেরা সঙ্গে ছিল। এদিক-ওদিক ঘুরে ছবি তুলছিলাম। পরিচিতি একজন এসে বলল, ধানমন্ডিতে পাকিস্তানি আর্মিরা গোলাগুলি করছে। এরপর আমরা দেখলাম দূর থেকে পাকিস্তানি আর্মিরা মার্চ করতে করতে আসছে। আমি ভাবলাম আরেকটু কাছে আসার পর ছবি তুলব। হঠাৎ ওরা গুলি করতে শুরু করল। তখন শেরাটনের সামনে একটা বাড়ি ছিল, ছুটে গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ি আমরা।

প্রশ্নঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি তোলার সময়কার অনুভূতির কথা বলুন।
সাইদা খানমঃ বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলতে গিয়ে মনে হয়েছে, আমি যেন সূর্যকে ধরে ফেলেছি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান পিজি (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল হাসপাতাল) হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেদিন জন্মদিন ছিল। তিনি তাঁর বাবাকে হাসপাতালে দেখতে যান। বাবা-ছেলের সাক্ষাৎকার সময়কার ছবি তুলি। এ সময় কবি জসীমউদ্‌দীন এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সে সময় আমি তাঁদের ছবি তুলি।

প্রশ্নঃ বর্তমানে অনেক মেয়েরা ফটোগ্রাফি করছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত? তাদের জন্য কোনো পরামর্শ...?
সাইদা খানমঃ খুব ভালো লাগে, এখন মোটামুটি অনেক মেয়ে ফটোগ্রাফিতে এসেছে। এটা বলতে পারো, চ্যালেঞ্জ। সব মেয়েরা কিন্তু ফটোগ্রাফিতে আসতে পারে না। বিশেষ করে প্রেস ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে নারী যারা কাজ করছে, সেটা আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় ব্যাপার।

প্রশ্নঃ আপনার সময় নারী আলোকচিত্রী হিসেবে যদিও একা ছিলেন তবুও এখনকার সময়ে এবং তখনকার সময়ে নারী আলোকচিত্রীদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে?
সাইদা খানমঃ হ্যাঁ (একটু হেসে বলেন)। তা তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধরো বর্তমান মেয়েরা একটা জিন্স প্যান্ট আর টপস পরে কাজে যেতে পারছে, ফটো তুলতে পারছে কিন্তু আমাদের সময় আমরা শুধু শাড়িই পরতাম। আমি শাড়ি পরেই ফটোগ্রাফি করেছি। অনেক ভিড়ের মধ্যে ফটোগ্রাফি করেছি শাড়ি পরেই। আমার চোখে এ পার্থক্যটা ধরা পড়েছে।

প্রশ্নঃ একজন ফটোগ্রাফার আর একজন ফটো জার্নালিস্টের মধ্যে পার্থক্য কী?
সাইদা খানমঃ যে ফটোগ্রাফার, সে-ই ফটো জার্নালিস্ট। আর যে ফটোগ্রাফি করে পত্রিকার জন্য, সে ফটো জার্নালিস্ট না। তবে ফটো জার্নালিস্টদের অনেক বেশি সাহসী, জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয় থাকতে হয় সেটা হলো ফটো জার্নালিস্টদের খুব ফ্রেন্ডলি হতে হয়। সেটা অবশ্যই যারা শুধু শখের বশে করে, তাদের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত। আমি বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ঘুরে ছবি তুলেছি। কখনো প্রেস ফটোগ্রাফার আবার কখনো ফ্রিলেন্সার হিসেবে। বহু জাতি, বহু ধর্মের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমি পরিচিত হয়েছি। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা জেনেছি, তাদের অন্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছি। এসব শুধু যে ছবি তোলার কারণে নয়, আমার ব্যবহারের কারণে।

প্রশ্নঃ ফ্রিলেন্সিংয়ে কিছুদিন কাজ করার পর পত্রিকায় কাজ করা ভালো নাকি ফটোগ্রাফি শেখার পর সরাসরি পত্রিকায় কাজ করা ভালো?
সাইদা খানমঃ ভালো কাজ করতে পারলে, সবভাবেই করা সম্ভব। তবে আমি মনে করি, ফ্রিলেন্সিং হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে পত্রিকায় কাজ করা ভালো। এতে পত্রিকায় কাজ করার জন্য অনেকটা সহজ হয়।

প্রশ্নঃ এখন কি ফটোগ্রাফি করেন?
সাইদা খানমঃ করি মাঝেমধ্যে, খুব একটা করা হয় না। বয়স হয়েছে, তাই বেশির ভাগ সময় ঘরেই কাটাই।

প্রশ্নঃ অবসরে কীভাবে সময় কাটান?
সাইদা খানমঃ এখন আর কী, বয়স হলে যেমনটি যায় সময়। মাঝে মাঝে একটু লেখালেখি করি, বই পড়ি গল্প-প্রবন্ধ; এই আর কী? আর মাঝে মাঝে গান শুনি। সময় করে মাঝে মধ্যে বাইরে যাই, গাড়িতে করে খুব একটা জার্নি করা হয় না।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, আপনি তো বিয়ে করেননি? সেটা ঠিক কী কারণে? যদি বলা সম্ভব হয়
সাইদা খানঃ আসলে বিয়ে নিয়ে কখনো ভাবিনি। সব সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কখনো নিজের জীবনের সঙ্গে অন্য কাউকে মিলাতে চাইনি।

প্রশ্নঃ আলোকচিত্রী হিসেবে আপনার অর্জন?
সাইদা খানঃ ১৯৫৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কোলন, জার্মানি। ১৯৬০ সালে অল পাকিস্তান ফটো কনটেস্টে প্রথমস্থান অধিকার। ১৯৮০ সালে সার্টিফিকেট ইন কমনওয়েলথ ফটো কনটেস্ট সাইপ্রাস। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো অ্যাওয়ার্ড জাপান ঢাকা। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সম্মানসূচক ফেলো প্রদান। ১৯৯৭ সালে অনন্যা শীর্ষ দশ ৯৬। ২০০০ সালে 'বেগম' পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি পুরস্কার ও ২০০২ সালে বি.পি.এস-এর রজতজয়ন্তী পদক। ২০০৭ সালে সম্মাননা স্মারক আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে আলোকচিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা। এছাড়া আমি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্যপদ অর্জন করেছি।

প্রশ্নঃ আপনি তো মাদার তেরেসারও ছবি তুলেছেন?
সাইদা খানমঃ সময়টা ১৯৭৩ সাল। মাদার তেরেসা ঢাকায় এলেন, তখন পুরান ঢাকার একটি আশ্রমে উঠেছিলেন। সকালে খবরের কাগজে তাঁর আসার খবর পড়েই আমি ক্যামেরা নিয়ে দেখা করতে চলে যাই। গিয়ে দেখলাম তিনি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। আমি তাকে শ্রদ্ধা জানালে তিনি আমাকে দোয়া করলেন। এর পর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি গাড়িতে ওঠার আগ মুহূর্তে আমাকে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসেন। তাঁর এমন ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এর পর আমরা তেজগাঁওয়ের শিশুদের একটা আশ্রমে যাই। সেদিন আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি। অসহায় শিশুতে আশ্রমটি ভর্তি। মাদার তেরেসা শিশুদের বুকে জরিয়ে ধরলেন, ওদের সাথে খেলতে শুরু করলেন। আমার ক্যামেরায় সেসব দৃশ্য ধারণ করলাম।

প্রশ্নঃ আপনার নিশ্চয় অনেক ছবির প্রদর্শনী হয়েছে? কোনো বিশেষ প্রদর্শনী নিয়ে বলুন।
সাইদা খানমঃ আমার তিনটা প্রদর্শনীর কথা বলতে পারি– সত্যজিৎ রায়, মাদার তেরেসা এবং শান্তিনিকেতন ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে করা। বহু বছর ধরে কণিকাদির সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমার বড় ভাই আবদুল আহাদ (রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞ ও প্রখ্যাত সুরকার) স্কলারশিপ নিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। সেখানেই কণিকাদির সাথে তাঁর পরিচয় হয়। কিন্তু সে সময়ে সমাজের দুটি ভিন্ন ধর্মের নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচলন ছিল না বলে ওদের সম্পর্কটা পরিণতি পায়নি।

প্রশ্নঃ আপনার আলোকচিত্রী জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তের কথা বলুন?
সাইদা খানমঃ একটা বিশেষ স্মৃতি এখনো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে আমি ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম। এর আগে কখনো তাঁর ছবি তুলতে যাওয়া হয়নি আমার। বঙ্গবন্ধুকে দূর থেকে অনেকবার দেখেছি; কিন্তু কাছে গিয়ে ছবি তুলতে সাহস হতো না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আমি ছবি তুলতে গেলাম। ছবিও তুললাম। ছবি তুলতে দেখে বঙ্গবন্ধু আমাকে বিদেশি ভেবেছিলেন। মনে করেছিলেন, আমি অন্য রাষ্ট্র থেকে আসা কোনো নারী আলোকচিত্রী। আমি যে বাংলাদেশি মেয়ে, তিনি ভাবতে পারেনি।

প্রশ্নঃ বর্তমান সময়ের নারী আলোকচিত্রীদের সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?
সাইদা খানমঃ আমাদের সময়ে, আমরা যখন ছবি তুলতাম, তখন প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হতো। কখন সূর্যটা কোথায় থাকবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিনা। বর্তমানে সবকিছু অনেক উন্নত। সাংবাদিকতায় মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, সাথে সাথে আলোকচিত্রে মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার মূলবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।
সাইদা খানমঃ আপনাকেও ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি: এক অসাধারণ উত্থানের গল্প

ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি আসলেই বিস্ময়কর। সাফল্যের এ গল্প ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা দেখে বেশ খানিকটা অবাক। গত বছর জুনের শেষে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনৈতিক সাময়িকী 'দি ইকোনমিস্ট' জানিয়েছে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় (অর্থবছর ২০১৬) এক হাজার ৫৩৮ মার্কিন ডলার। পাকিস্তানের চেয়ে এই হার ৬৮ মার্কিন ডলার বেশি। অবশ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অর্থবছর ২০১৭-এর তথ্য দিয়ে বলেছে, আমাদের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। 'দি ইকোনমিস্ট' জানিয়েছে, এক দশকে

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস '২০৫০ সালের বিশ্ব' (world in 2050) শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলেছে, আসন্ন বছরগুলোয় পুরো বিশ্বে যে তিনটি দেশ খুবই দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে, তার একটির নাম বাংলাদেশ

পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৩-৪ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর বাংলাদেশে সেই হার ছিল গড়ে ৬ শতাংশেরও বেশি। সর্বশেষ অর্থবছর ২০১৭-তে এই হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। তিন বছর ধরেই তা ৭ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে। সে কারণেই সাময়িকীটি বলছে, 'বাংলাদেশ অতীতের ছাই থেকে বের হয়ে এসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক সফল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।' অর্থবছরে মোট জিডিপির পরিমাণ ছিল ২৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস '২০৫০ সালের বিশ্ব' (world in 2050) শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলেছে, আসন্ন বছরগুলোয় পুরো বিশ্বে যে তিনটি দেশ খুবই দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে, তার একটির নাম বাংলাদেশ। ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতা অনুযায়ী মোট জিডিপির হিসাব করে ওই প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩১তম। ২০৩০ সাল নাগাদ যদি এই অবস্থানের আরো উন্নতি ঘটে, তা হবে ২৮তম। ২০৫০ সালে তা হবে ২৩তম। তার মানে ওই সময় উন্নত বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার হবে পৃথিবীর বৃহৎ ২৩টি দেশের একটি। বাংলাদেশের এই নজরকাড়া অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প শুনে সত্যি গর্বে মন ভরে যায়।

কেমন করে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটল, সে কথা বলার আগে কী পরিপ্রেক্ষিতে তার জন্ম হলো এবং জন্মের পরপরই কী

নিদারুণ অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছিল, সেদিকে একটু নজর দিতে চাই। ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে পূর্ব বাংলা বলা হলেও তা পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত ছিল। ১৯৪৬ সালের গণভোটে পূর্ব বাংলার মানুষের ব্যাপক সমর্থনের কারণেই পাকিস্তান নামের এক অবাস্তব রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময় বাঙালি ভেবেছিলেন জমিদারি প্রথার বিলোপ হবে এবং সংখ্যাগুরু অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে দ্রুতই পূর্ব বাঙলার অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব হবে। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় বাঙালির সে স্বপ্ন ভেঙে গেল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উপেক্ষা করার কারণে সেই সময়ের তরুণ ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। জেল থেকে মুক্ত হয়েই তিনি ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় ছাত্রদের ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। প্রথমে ছাত্রলীগ, তারপর আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং অবশেষে আওয়ামী লীগ গঠনে তিনি সুদৃঢ় নেতৃত্ব দেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও একদল তরুণ রাজনীতিককে নিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের মনের ক্ষোভ ও বঞ্চনার কথা বলতে থাকেন। ওই সময়টায় পূর্ব বাংলায় খাদ্য ও শিক্ষার সংকট তীব্র ছিল। তাই সেই সময়ে চলমান ভাষা আন্দোলনের বাস্তব আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিরাজ করছিল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনেরও প্রেরণার উৎস ছিলেন বন্দি শেখ মুজিব। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা। শুরু হয় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের পর্ব। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষক সন্তানদের সংগঠিত করে তিনি গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিই প্রাধান্য পায়। ২১ দফার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল বিজয়, সরকার গঠন ও তার পতন শেখ মুজিব ও তাঁর সহনেতাদের দারুণ হতাশ করে। তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এর প্রতিফলন ঘটে তাঁর দেওয়া ছয় দফায়। অবশ্য তত দিনে বাঙালি অর্থনীতিবিদরাও পাকিস্তানের 'দুই অর্থনীতি'র কথা বেশ জোরেশোরেই বলতে শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে গভীর সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি জেলেই কাটাতেন। শেষবার আগরতলা ষড়যন্ত্রের শিকার শেখ মুজিব ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তি পান এবং বঙ্গবন্ধু হিসেবে জনস্বীকৃতি লাভ করেন। এরপর স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে। সামরিক সরকারের কাছে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ক্ষমতাসীন সামরিক সরকার জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। বঙ্গবন্ধু জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুত সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু সেই নির্বাচনের রায় অস্বীকার করায় তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক জগদ্বিখ্যাত ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। আসলে সেই আন্দোলনটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব। আর সেই ভাষণটি ছিল কার্যত বাঙালির মুক্তির ডাক। আজ তাই ইউনেস্কোর 'বিশ্ব মেমোরি' নামের ঐতিহ্যের অংশ। ২৫ মার্চ রাতে আচমকা গণহত্যা শুরু হলে তিনি ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য দলে দলে ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও নৈতিক উপস্থিতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন মূলত কৃষক ও সাধারণ পরিবারের সদস্য। তাঁদের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু তাঁদের হতাশ করেননি। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার এক মরণপণ সংগ্রামে নেমে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল একেবারেই ভঙ্গুর। পাকিস্তান আমলে বাঙালির মাথাপিছু আয় একজন পশ্চিম পাকিস্তানির মাথাপিছু আয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মতো ছিল। বাঙালির পাট রপ্তানি করে যে বিদেশি মুদ্রা আয় হতো, তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। করাচি ও ইসলমাবাদের রাজধানী গড়ে তোলার কাজে তা ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রশাসনের সিংহভাগই অ-বাঙালি বলে পূর্ব বাংলায় কিছু শিল্প, ব্যাংক ও বীমা গড়ে তুললেও মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এসব চালানোর মতো যথেষ্ট উদ্যোক্তাও ছিল না বলে এগুলো দ্রুত জাতীয়করণ করা হয়। কালবিলম্ব না করে অবকাঠামো গড়তে মন দেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণে নানা উদ্যোগ, দ্রুত সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, নতুন করে বিদেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেও সহজ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের আগের বাংলাদেশের রপ্তানি (৩২%) ও আমদানির (৩৭%) বড় অংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে। হঠাৎ করে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ সংকটের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এক ডলারও রিজার্ভ নেই। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে ভারত ও রাশিয়া তাদের সাধ্যমতো অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ছিল আরো ব্যাপক। বঙ্গবন্ধুর ডাকে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ নিয়ে আশঙ্কার শেষ ছিল না। এ রকম একটি পরিপ্রেক্ষিতে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও বড় পরাশক্তিগুলোর ধারণা হয়েছিল যে, সদ্যস্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশ হয়তো মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না। হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন এক কমিটি মনে করেছিল, এটি হবে 'আন্তর্জাতিক এক তলাবিহীন ঝুড়ি'। এখানে যতই সাহায্য ঢালা হোক না কেন, তা কোনো কাজেই লাগবে না। তাই দেশটিতে দ্রুতই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেবে। ওই সময় সিআইএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এত অল্প জায়গায় এত মানুষের বাস ও এত দারিদ্র্যের কারণে দেশটি তার প্রতিবেশী এবং বিশ্বের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে (১৯৭২) বলা হয়, পুরো পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের মাথাপিছু আয় ছিল ৫০-৬০ ডলারের মতো এবং তা ছিল প্রায় স্থবির। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের গড় আয়ু ছিল ৫০ বছরেরও কম। বেকারত্বের হার ছিল ২০-৩০ শতাংশ। শিক্ষার হার ২০ শতাংশ। প্রকৃতি ছিল ভয়ংকর প্রতিকূল। সব মিলে দেশটির টিকে থাকাই মুশকিল হবে। প্রায় অভিন্ন সুরে বিশ্বব্যাংকের দুই সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ইউস্ট ফাল্যান্ড ও জন পার্কিনসন (১৯৭৬) এক বইয়ের শিরোনাম দিয়েছিলেন

> *হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন এক কমিটি মনে করেছিল, এটি হবে 'আন্তর্জাতিক এক তলাবিহীন ঝুড়ি'। এখানে যতই সাহায্য ঢালা হোক না কেন, তা কোনো কাজেই লাগবে না। তাই দেশটিতে দ্রুতই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেবে। ওই সময় সিআইএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এত অল্প জায়গায় এত মানুষের বাস ও এত দারিদ্র্যের কারণে দেশটি তার প্রতিবেশী এবং বিশ্বের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে*

'বাংলাদেশ: অ্যা টেস্ট কেইস অব ডেভেলপমেন্ট'। প্রতিকূল প্রকৃতি ও বিপুল জনসংখ্যা দেশটির উন্নয়নের সব সম্ভাবনা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে ফেলবে বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল। মানুষ নয়, প্রকৃতিই এ দেশের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশের কোনো সম্ভাবনাও তাঁদের চোখে পড়েনি। ভাবখানা, বাংলাদেশে যদি উন্নয়ন হয় তাহলে সব দেশই উন্নতি করতে পারবে।

ভাবতে ভালো লাগছে, সেই 'হতভাগ্য' দেশটিই আজ উন্নয়নের রোলমডেল বলে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে। মনে রাখতে হবে, এর ভিত্তিভূমি গড়ে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির গোড়াপত্তন তিনিই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে তৈরি সংবিধানের মূল নীতিগুলোর দিকে তাকালেই আমার এই কথার সত্যতা মিলবে। আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় পর্বে 'রাষ্ট্রনীতির মৌলনীতি' অংশে সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, কৃষক, শ্রমিক ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষগুলোকে সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। জীবন চলার মৌলিক চাহিদা (যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা), কাজের সুযোগ, উপযুক্ত অবসর, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে ১৫ ধারায়। ১৬ ধারায় গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের উদ্যোগ রাষ্ট্র নেবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ সব নাগরিকের সন্তানদের দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ১৭ ধারায়। ১৮ ধারায় জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রকে দিতে বলা হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার ১৮-ক ধারায় দেয়া হয়েছে। ১৯ ধারায় নারী ও পুরুষের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের এই নৈতিক অবস্থানের আলোকেই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ওই পরিকল্পনার অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। বাংলাদেশের কলঙ্ক পাকিস্তানপন্থী একদল বিশ্বাসঘাতকের আঘাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন আমাদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। মাঝখানে অনেক বছর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির শাসন-শোষণ সত্ত্বেও নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পান। বঙ্গবন্ধুও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাংলাদেশ গড়ার কাজে তিনি অনেক দূর এগিয়ে যান। ফের ছন্দপতন ২০০১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বদেশ হাঁটতে থাকে উল্টোপথে। এরপর আসে সামরিক হস্তক্ষেপ। অন্যায়ভাবে তাঁকে জেলে নেওয়া হয়। ফের আসে নির্বাচন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ২০০৮ সালের শেষদিকে নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এরপর এক দশক ধরে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সমৃদ্ধ ও গরিবহিতৈষী অর্থনীতি গড়ার। এই পর্যায়ে তিনি দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলছেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে পড়েছে। মনে রাখতে হবে, ১৯৭৩ সালে যে অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলার, আজ তার আকার হয়েছে ২৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি (৩১ গুণেরও বেশি)। তখন সঞ্চয়ের হার ছিল জিডিপির ৩ শতাংশ। আর আজ তা জিডিপির ৩১ শতাংশ। তখন বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ৯ শতাংশ। আজ তা ৩০ শতাংশেরও বেশি। ওই সময় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ০.৭ বিলিয়ন ডলার। আজ তা ৩৫ বিলিয়ন ডলার। আমদানির পরিমাণ ছিল তিন বিলিয়ন ডলার, আর আজ তা ৪৭ বিলিয়ন ডলার। তখন মাথাপিছু আয় ছিল ১১০ ডলার। আজ তা এর ১৫ গুণেরও বেশি। জিডিপি বৃদ্ধির প্রভাব কর্মসংস্থানের ওপরও পড়েছে। গত বছর দেশ-বিদেশে ২৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। পুরো দশক ধরেই গড়ে ২০ লাখের মতো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এক দশক ধরে গড়ে ১৩ বিলিয়নের বেশি করে রেমিট্যান্স আসছে। বেকারত্বের হার ধীরে ধীরে কমছে। গত বছর তা ৪.২ শতাংশে নেমে এসেছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স মিলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। এফডিআই গত বছর ছিল আড়াই বিলিয়ন ডলার। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এফডিআই বাড়তে থাকবে। চলতি আর্থিক বছরে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আকার ১ হাজার ৫৩৩ বিলিয়ন ডলার। গত বছর এডিপির ৮২ শতাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এ বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খাদ্য উৎপাদন খানিকটা বিঘ্নিত হলেও গড়পড়তা এখন যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে, তা তিয়াত্তরের তুলনায় চার গুণেরও বেশি। চালের দাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রথমে বাড়লেও ধীরে ধীরে তা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। আশি-নব্বইয়ের দশকের তুলনায় হালের দুই দশকে চালের মূল্য ছিল খুবই স্থিতিশীল। শুধু চলতি বছরটা ছিল ব্যতিক্রমী।

অর্থনীতির সূচকগুলো বাড়ন্ত বলেই আমাদের সামাজিক সূচকগুলোও সমানতালে বাড়ছে। যেমন আমাদের দারিদ্র্যের হার এখন ২৪.৩ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে তা ছিল ৫০ শতাংশের মতো। ওই সময় অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৪ শতাংশ। এখন তা ১২.৯ শতাংশ। ১৯৭৩ সালে মোট প্রজনন হার ছিল ৬.৯৬। আর এখন তা ২.১। ২০০৫ সালেও তা ছিল ২.৪৬। এখন জন্মমুহূর্তে প্রত্যাশিত জীবনকাল ৭২.২ বছর, ২০০৫ সালে তা ছিল ৬৫.২ বছর। আর ১৯৭৩ সালে ছিল ৪৮ বছরের সামান্য কম। শিশুমৃত্যুর হার এখন প্রতি হাজারে ৩৫। ২০০৫ সালে তা ছিল ৬৮। মাতৃমৃত্যুর হারও একইভাবে কমেছে। ২০০৫ সালে ছিল লাখে ৩৪৮ জন। ২০১৫ সালে তা ছিল ১৭০। শিক্ষার হার (১৫+) পাকিস্তান আমলে ছিল ২০ শতাংশেরও কম। এখন তা ৭২.৩ শতাংশ। ২০০৫ সালে ছিল তা ৫৩.৫ শতাংশ।

আমরা আশা করছি, ২০২৭ সাল নাগাদ আমরা পুরোপুরি স্বল্পোন্নত দেশের তকমা ছেড়ে যাব। এর তিন বছর আগেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশের গণ্ডি থেকে বের হব। তবে কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরের জন্য আরো তিন বছর পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে থাকতে হবে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে আমরা এরই মধ্যে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। আমরা ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি পূরণ শেষে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হব। এর পরের স্বপ্ন হলো ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। তখন আমাদের মাথাপিছু আয় হবে ১৬ হাজার ৬০০ মার্কিন ডলার এবং এই রূপান্তর সম্ভব। ২০০৯ সালে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। আজ তা ১৫ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। মাত্র আট বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে পাঁচগুণ। বাংলাদেশ ব্যাংক উন্নয়নমুখী ভূমিকা নেওয়ার কারণে এ দেশের কৃষক, খুদে উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা ঋণ পাচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশ হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল আর্থিকসেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এর ইতিবাচক প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্য, ই-কমার্স ও কর্মসংস্থানের ওপর পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে প্রবৃদ্ধিও গরিবহিতৈষী হচ্ছে।

উন্নত দেশ হওয়ার এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের বিনিয়োগের হার জিডিপির আরো ১৬ শতাংশ বাড়াতে হবে। সরকার পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মেট্রো রেলসহ বহু বড় অবকাঠামো বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, আইনকানুন সহজ করা, মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রাখা, শিল্পায়ন আরো জোরদার করা, দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলো আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। সেজন্য চাই গুণমানের শিক্ষা, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সূচকের ব্যাপক উন্নতি, প্রশাসনের ব্যাপক জবাবদিহি ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সুশাসনের সব সূচকের উন্নতি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আমাদের আর্থিক খাতে হালে অনেক অনিয়মের খবর জানতে পারছি। খেলাপি ঋণ ব্যাপক হারে বাড়ছে। বেশ কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও প্রকাশিত হচ্ছে। এ খাতে দুর্নীতির নানা সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সুশাসনের স্বার্থেই দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। মনে রাখা চাই, এ দেশের তরুণসমাজ সুশাসনবিরোধী কোনো কিছুই পছন্দ করে না। এ কথাটি নীতিনির্ধারকদের মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সবুজ প্রবৃদ্ধির কৌশলের দিকেও আমাদের মনোযোগী থাকতে হবে। শিল্পের অনুরূপ কৃষি খাতের উন্নয়নেও উদারনীতি ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যাংকের ঋণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সুবিধা প্রদানের ফলে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি সবজি ও মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের পুষ্টির মানও বেড়েছে। তবে উন্নয়নের এই গতি আরো বেগবান করতে হলে জনশক্তির দক্ষতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, গবেষণা ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চলমান 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের' সুযোগ সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তরুণ কর্মী ও নেতৃত্ব তৈরির প্রশ্নে আমাদের নিরন্তর নিবেদিত থাকতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সুস্থিতি যেকোনো মূল্যে সংরক্ষণ করে আমাদের একযোগে এগিয়ে যেতে হবে। আসুন আমরা শহীদদের আত্মত্যাগের নামে অঙ্গীকার করি যে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য নিরন্তর একাত্তরের মতো ঐক্যবদ্ধ ও সংবেদনশীল থাকব।

লেখক: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

(এই প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত)

উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানেই আলু-পটোলের বাম্পার ফলন নয়

আমীন আল রশীদ

হালে 'উন্নয়ন' শব্দটি আমাদের যাপিত জীবন, বিশেষ করে রাজনীতিতে এত বেশি ব্যবহৃত এবং উচ্চারিত যে, অনেক সময় শব্দটি নিয়ে নানাবিধ মশকরাও হয়। কখনো 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' শব্দটি নিয়ে রসিকতা বা উপহাসও চলে। যেমন গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন দেশের গণমাধ্যমের ওপর সুস্পষ্ট সেন্সরশিপ ছিল এবং তৎকালীন সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রেসক্রিপশনে বহু রাজনীতিবিদের কথিত জবানবন্দিও অধিকাংশ গণমাধ্যম ছাপতে বাধ্য হয়েছিল, ওই সময়ে আমরা রসিকতা করে সহকর্মীদের বলতাম, 'সিরিয়াস রিপোর্টিং বাদ দিয়া উন্নয়ন সাংবাদিকতা করেন। যেমন সেলাই শিখে স্বাবলম্বী সাথী; মুন্সিগঞ্জে আলুর বাম্পার ফলন; নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করল ব্রি ইত্যাদি।' এখন প্রশ্ন হলো, এগুলোই কি উন্নয়ন সাংবাদিকতা?

রাজনীতিবিদরা উন্নয়ন বলতে মানুষের সামনে যা হাজির করেন, তার অনেক অনুষঙ্গ নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায় এবং নাগরিকরা এই প্রশ্ন করতে পারছে কি না--সেটিও উন্নয়নের একটি সূচক বলে মনে করা হয়

'উন্নয়ন' বলতে আমরা আসলে কী বুঝি? অর্থনীতিবিদরা নানাবিধ তত্ত্ব ও সংজ্ঞা দিলেও একজন দিনমজুরের কাছে বা স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে উন্নয়ন মানে গতকাল যেরকম ছিলাম, আজ তার চেয়ে একটু ভালো থাকা। অর্থাৎ উন্নয়ন মানে ইতিবাচক বা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এখানে জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, চাহিদা, জোগান ইত্যাদি খটমট শব্দ সাধারণ নাগরিকের জীবনকে খুব একটা স্পর্শ করে না। রাজনীতিবিদরা উন্নয়ন বলতে মানুষের সামনে যা হাজির করেন, তার অনেক অনুষঙ্গ নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায় এবং নাগরিকরা এই প্রশ্ন করতে পারছে কি না–সেটিও উন্নয়নের একটি সূচক বলে মনে করা হয়।

উন্নয়নের একটা বড় সূচক হলো দৃশ্যমানতা অর্থাৎ অবকাঠামো। যেমন বড় বড় ফ্লাইওভার, চার লেনের রাস্তা, রাস্তায় দামি গাড়ি, মেট্রোরেল, সেতু, বহুতল ভবন ইত্যাদি। মানুষের যোগাযোগ সহজ করতে এসব উন্নয়নের বিকল্প নেই। কিন্তু যখন এক বর্গফুট রাস্তা বা একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের খরচ তুলনামূলক বেশি হয়। সেটিকে আমরা উন্নয়ন বলতে পারি কি না, সেই প্রশ্ন তোলাও সংগত।

ফলে প্রশ্ন হলো, উন্নয়নটা আসলে কার হচ্ছে? রাজনীতিবিদের? ঠিকাদারের? প্রকল্প কর্মকর্তার? সরকারি কর্মকর্তার? চিফ ইঞ্জিনিয়ারের? বলা হবে, তাদের উন্নয়ন হলেও আখেরে এর সুফল তো জনগণই পাচ্ছে। রাস্তা, সেতু বা ফ্লাইওভার নির্মাণে দুর্নীতি হলেও সাধারণ মানুষই তো সেসব ব্যবহার করছে, অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা আছে। কেননা, ওই টাকাটা রাষ্ট্রের, মানে জনগণের। সুতরাং উন্নয়ন সাংবাদিকতা হচ্ছে, উন্নয়নের নামে যেসব অনিয়ম হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করাও।

একজন নারী সেলাই শিখে স্বাবলম্বী হলে, আলুর বাম্পার ফলন হলে, ব্রি নতুন কোনো জাতের ধান উদ্ভাবন করলে সেটি অবশ্যই উন্নয়ন সংবাদ। কিন্তু তার চেয়ে বড় উন্নয়ন সংবাদ, উন্নয়ন নিয়ে যে মিথ ও ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হয়, সেটিকে চ্যালেঞ্জ করা। সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে জড়িত স্বাধীন সাংবাদিকতা। উন্নয়ন ইস্যুতে গণমাধ্যম যদি সঠিক প্রশ্নটি করতে না পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে আমাদের সাংবাদিকতা পরাধীন এবং কিছু লোকের উন্নয়ন হলেও আখেরে জনগণের পয়সার হিসাব আমরা নিতে পারছি না। জনগণের পয়সার হিসাব নিতে পারাটাই সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

আবার উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়, পাশাপাশি এর সঙ্গে নানারকম আর্থ-সামাজিক বিষয় জড়িত, সেগুলোও খেয়াল করা। সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে কারা লাভবান হবেন এবং বিশেষ কোনো শ্রেণিপেশার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কি-না, সে বিষয় তুলে ধরা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় প্রকল্পের বা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের মতামত যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনি এর ভালো দিকগুলোও জনগণকেও বোঝাতে হয়। এ ধরনের রিপোর্ট হতে হয় বিশ্লেষণধর্মী এবং অনুসন্ধানমূলক। ফলে এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে গবেষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। গৃহীত প্রকল্প বা কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবিত বাজেট, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি দিকগুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরতে হয়।

নতুন কোনো প্রযুক্তি বা পন্থা অবলম্বন করে কেউ যদি নিজের ভাগ্যোন্নয়ন করে থাকেন, সেক্ষেত্রে অন্যদের উৎসাহ দিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গল্প প্রচার ও প্রকাশ করাও এক ধরনের উন্নয়ন সাংবাদিকতা। সাধারণ মানুষকে এটা বোঝাতে হয় যে, উন্নয়ন কোনো দল বা বিশেষ গোষ্ঠীর দানের ফসল নয়; বরং প্রত্যেকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হয় নিজেদেরই।

আমাদের দেশে ফি বছর হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন হয়। কিন্তু সেই উন্নয়নের উল্টোপিঠ প্রকাশ হয় বর্ষার মৌসুমে। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই তলিয়ে যায় রাজধানী, বিশাল নদীতে পরিণত হয় বাণিজ্যনগরী চট্টগ্রাম। বৃষ্টি মানেই পুরো ঢাকার রাজপথ পরিণত হয় গাড়ি পার্কিংয়ে। তখন শুধু বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের সেই গানই মনে আসে, 'গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে গাড়ি চলে না।' তো গাড়িই যদি রাস্তায় না চলে, তাহলে এত এত পয়সা কেন খরচ, কেন ওই ফ্লাইওভার, কেন চার লেন, কেন হাজার কোটি টাকার সেতু? উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানে এই 'কেন'র উত্তর খোঁজা।

হাওরের মাছ খেয়ে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। হাওরের দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ দেখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ছবি আঁকি। কিন্তু সেই হাওরের বাঁধ ভেঙে যখন লাখো মানুষের জীবন বিপন্ন হয়, হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়, বিষাক্ত অ্যামোনিয়ায় মাছ মরে ভেসে ওঠে, তখন আমাদের প্রশ্ন করতে হয়, জনগণের পয়সায় উন্নয়নের নামে যে বাঁধ নির্মাণ করা হলো, সেটি কেন ভেঙে গেল? বাঁধ যদি অতিবৃষ্টি কিংবা পানির তোড়ে ভেঙেই যাবে, তাহলে সেই বাঁধ নির্মাণের অর্থ কী? রোদ ঠেকানোর জন্য নিশ্চয়ই বাঁধ দেয়া হয় না। মানুষের জানমাল রক্ষা তথা তার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তার করের পয়সায় কিংবা কখনো বিদেশিদের পয়সায় অথবা ঋণে যে বাঁধ নির্মাণ করা হলো, সেই বাঁধ কেন মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বদলে মানুষের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিল? যারা সেই বাঁধ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের জবাবদিহিতা কোথায়? এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সাংবাদিকতার নামই উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। গরিব মানুষের পকেটেও মোবাইল ফোন। সামাজিক যোগাযোগ বেড়েছে। মানুষ স্মার্ট হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই তথ্যপ্রযুক্তির বিবিধ পন্থায় অপব্যবহারও হচ্ছে। একদিকে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচলে তথ্যপ্রযুক্তি যেমন বিশাল ভূমিকা রাখছে, পক্ষান্তরে এর অপব্যবহারে মানুষের জীবনও বিপন্ন হচ্ছে। ফলে এটি হচ্ছে উন্নয়নের উল্টোপিঠ। সেই উল্টোপিঠের খবরও আমাদের রাখতে হয়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানে শুধু আলু-পটোলের বাম্পার ফলন আর নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প নয়; বরং উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানে উন্নয়নসম্পর্কিত যাবতীয় ক্রিটিক্যাল বা জটিল প্রশ্নসমূহের অবতারণা করা এবং সেই অর্থে উন্নয়ন সাংবাদিকতা অনুসন্ধানী ও অপরাধ সাংবাদিকতাও বটে।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় প্রকল্পের বা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের মতামত যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনি এর ভালো দিকগুলোও জনগণকেও বোঝাতে হয়। এ ধরনের রিপোর্ট হতে হয় বিশ্লেষণধর্মী এবং অনুসন্ধানমূলক। ফলে এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে গবেষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। গৃহীত প্রকল্প বা কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবিত বাজেট, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি দিকগুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরতে হয়

সম্ভাবনার উন্নয়ন সাংবাদিকতা

মো. ইলিয়াছ হোসেন

সাংবাদিকতায় এক বিশেষ ধারা বা প্রবাহ উন্নয়ন সাংবাদিকতা। উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়টি ইংরেজিতে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম হিসেবে পরিচিত। উন্নয়ন সাংবাদিকতা নেতিবাচক বিষয় বর্জন করে ইতিবাচক বিষয়কে উৎসাহিত করে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়ে 'থমসন ফাউন্ডেশন'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও যথার্থ তথ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের গ্রাম ও শহরের অগ্রগতি বা অগ্রগতির পথে বাধাগুলো পাঠযোগ্য করে প্রতিবেদন রচনাকে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলা যায়। উন্নয়ন সাংবাদিকতা শহর এবং গ্রামের মধ্যে

উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়ে 'থমসন ফাউন্ডেশন'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও যথার্থ তথ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের গ্রাম ও শহরের অগ্রগতি বা অগ্রগতির পথে বাধাগুলো পাঠযোগ্য করে প্রতিবেদন রচনাকে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলা যায়

সেতুবন্ধ রচনা করে, যা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।'

উন্নয়নপ্রত্যাশী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় উন্নয়ন সাংবাদিকতা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নকর্মী, তরুণ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের পাঠক, বেতার-টেলিভিশনের শ্রোতা-দর্শক সবার কাছে এখন উন্নয়ন সাংবাদিকতা এক পরিচিত ও জনপ্রিয় বিষয়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় সম্ভাবনা: সমাজ উন্নয়নে শুধু সভা-সেমিনার, সহিংসতা, খুন, ধর্ষণ, মারামারি, লুণ্ঠন, দুর্ঘটনা– এ ধরনের সংবাদ প্রচারই যথেষ্ট নয়। ঘটনার পেছনের ঘটনা তুলে আনা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। যেমন, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ কারণে প্রচুর কৃষিপণ্য আবাদ হয়। কৃষি উৎপাদন জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সবজি মৌসুমে তরমুজ, আলু ও টমেটোর প্রচুর আবাদ হয়। এসবের বাম্পার ফলন হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক কোল্ডস্টোরেজ না থাকায় অফ সিজনে এগুলোর ঊর্ধ্বমূল্য নাগরিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অপরদিকে ভরা মৌসুমে কৃষক ন্যায্য মূল্য পান না উৎপাদিত এসব পণ্য বিক্রি করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে এক মহা চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা উন্নয়ন সাংবাদিকতার

মাধ্যমে সম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা স্থাপনে দেশ এখন অনেক বড় সম্ভাবনার। এসব কারণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন সাংবাদিকতার এক বড় সম্ভাবনার দেশ।

উন্নয়ন ধারণা: উন্নয়ন ধারণা নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। এ ব্যাপারে একক কোনো মত পাওয়া যায় না। উন্নয়নের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। উন্নয়ন ধারণা স্থান, দেশ ও জাতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। দেশ-কাল ও অঞ্চলের ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারা নির্ধারিত হয়। উন্নয়নের মধ্যেই লুকায়িত থাকে উত্থান ও পতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উন্নয়ন ধারণা প্রসার লাভ করে। এতে অবসান ও পতন ঘটে ইউরোপের একক আধিপত্যের। উত্থান হয় ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের।

বিখ্যাত উন্নয়ন সমীক্ষক ইয়ানের মতে, উন্নয়নের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। বরং দেশ-কাল-অঞ্চলের ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারা নির্ধারিত হয়, ধারণা সুগঠিত হয়, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। উত্থান-পতনের মাঝেই উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক ইবন খলদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে প্রথম 'উন্নয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেখানে উন্নয়নকে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। তবে পরে কট্টরপন্থী, মার্কসবাদী, উদারনীতিবাদী আর পুঁজিবাদী দর্শনের কারণে 'উন্নয়ন'কে একটি দৃষ্টিভঙ্গির আদলে বিশ্লেষণ করার ধারাটির পরিবর্তন ঘটে।

কিংবা উত্তেজনাকর বিষয়ের চেয়ে 'উন্নয়ন' বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য

১। উন্নয়নকে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে জানিয়ে দেয়া।
২। জণগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।
৩। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ।
৪। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সবাইকে অভিহিত করা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা কীভাবে তুলে আনা যায়

১. **ঘটনার গভীরে প্রবেশ করা :** সংবাদ বৈশিষ্ট্য ও সংবাদমূল্য বিবেচনায় তাৎক্ষণিকতা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংবাদ সবচেয়ে পচনশীল বিষয়, যা পাঠকের কাছে সময়মতো উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে তার মূল্য হারায়। উন্নয়ন সাংবাদিকতা এ অর্থে তাৎক্ষণিক কোনো রিপোর্ট বা কুইক ফায়ার রিপোর্ট নয়। উন্নয়ন সাংবাদিকতা হলো ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে গবেষণাধর্মী রিপোর্ট। উন্নয়ন সংবাদে প্রয়োজন ঘটনার গভীরে প্রবেশ করা। ঘটনার বিশ্লেষণ করা।

২. **পরিকল্পনার পর প্রয়োজন ব্যাপক ভ্রমণ :** অফিস কক্ষে বসে উন্নয়ন সাংবাদিকতা করা সম্ভব নয়। এমনকি তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত সময়েও উন্নয়ন রিপোর্ট তৈরি করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, সময় নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান, গবেষণা ও যথেষ্ট ধৈর্য। উন্নয়ন রিপোর্টের বিষয় নির্ধারণে পরিকল্পনার পর প্রয়োজন ব্যাপক ভ্রমণ। উন্নয়ন সাংবাদিকতায় বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে সংবাদ বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

৩. **জনস্বার্থ ও চাহিদা প্রতিফলিত করে মূল্যায়ন করা:** উন্নয়ন সাংবাদিকতায় প্রকাশিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত, দলীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারের সাফাল্যের বিষয় আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে কেবল প্রশংসা নয়। অতিরিক্ত প্রশংসা সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নবিদ্ধ করবে। উন্নয়ন সংবাদ হবে গঠনমূলক, সমালোচনামূলক, পর্যালোচনামূলক ও সত্যনিষ্ঠ। উন্নয়ন সংবাদে চাই জনস্বার্থ ও চাহিদা প্রতিফলিত করে মূল্যায়ন করা।

উন্নয়ন গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রপঞ্চ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ষাটের দশকের আগে এ ধারণাটি ছিল না। ষাটের দশকের সাংবাদিক তারজি বারীন্দ্র বিত্তচি প্রথম 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভাবন ঘটান। তার উদ্যোগে লোস বার্নোস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক মাকার্তো চাক্কি Depthnews নামে একটি ফিচার সার্ভিস সংস্থা শুরু করেন। প্রথাগত সাংবাদিকতার বদলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই এ সংস্থার প্রধান কাজ ছিল

এসবের কারণে উন্নয়ন বিষয়ের সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আর উন্নয়নকে তখন এভাবে বলা হয়, একটি নির্দিষ্ট সমাজে বিরাজমান অবস্থায় মানুষের সাধারণ চাহিদা নিবারণ করাকে উন্নয়ন বলে।

তবে বর্তমানে 'উন্নয়ন' বলতে সার্বিক জাতীয় উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়। 'উন্নয়ন' সম্পর্কে সবচেয়ে আধুনিক ধারণাটি হলো– 'মানুষের চরম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে পার্থিব সব বস্তু, উদ্ভিদ জগৎ এবং যা কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেগুলোর অনুসন্ধান, গুণ নির্ণয় এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মানবসমাজের যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড তার; ফলই হলো উন্নয়ন।'

উন্নয়ন নিয়ে বিবিধ ধারণার মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা'র ধারণাটিও আমাদের সমাজে প্রবেশ করে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ইতিহাস: উন্নয়ন গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রপঞ্চ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ষাটের দশকের আগে এ ধারণাটি ছিল না। ষাটের দশকের সাংবাদিক তারজি বারীন্দ্র বিত্তচি প্রথম 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভাবন ঘটান। তার উদ্যোগে লোস বার্নোস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক মাকার্তো চাক্কি Depthnews নামে একটি ফিচার সার্ভিস সংস্থা শুরু করেন। প্রথাগত সাংবাদিকতার বদলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই এ সংস্থার প্রধান কাজ ছিল। তাদের এ সংস্থার কার্যকলাপ থেকেই উন্নয়ন সাংবাদিকতায় তিনটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদি নিয়ামকগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরা। এ ধরনের সংবাদে সমাজের নেতিবাচক

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় অনেক চ্যালেঞ্জ, নানা বিতর্ক ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তারপরও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিকশিত হচ্ছে। অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতার অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নয়ন সাংবাদিকতায় সরকারের তোষামোদির পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার চর্চা করতে হবে। দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক হয় এবং জনগণ যদি সচেতন হয়, তাহলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে।

লেখক: সহ-সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর

উন্নয়ন যোগাযোগ ও উপনিবেশ

সুফিয়া বেগম

প্রত্যেক যুগে সব কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে যোগাযোগ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যোগাযোগের সেতুবন্ধ রচনার মধ্যে নিহিত আছে উন্নয়নের ধারা। উন্নয়ন যোগাযোগ (Development Communication) হচ্ছে একটি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ভিত্তি বা সহায়ক যোগাযোগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সাধারণ জনগণের আর্থসামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে।

উন্নয়ন যোগাযোগ একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্দিষ্ট জনগণের কাছে বার্তা প্রেরণ এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের গ্রহণ করতে, বুঝতে ও উৎসাহিত করতে শেখায়। জনগণের প্রচলিত অভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন

উন্নয়ন যোগাযোগ একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্দিষ্ট জনগণের কাছে বার্তা প্রেরণ এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের গ্রহণ করতে, বুঝতে ও উৎসাহিত করতে শেখায়

আনা উন্নয়ন যোগাযোগের মূল লক্ষ্য। মানুষ সহজে তার অভ্যাস বদল করে না। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অদৃষ্টবাদী, তাঁরা অনড়। উন্নয়ন যোগাযোগের উদ্দেশ্য– এসব মানুষকে তথ্য দিয়ে তাদের অনড়তা দূর করা, তাদের চিন্তাকে প্রসারিত করা, তাদের প্রভাবন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নয়নে তাদের অংশীদারি করে তোলা। ড. পি আর সিনহার মতে, 'Development communication is a depth reporting of event and situation impining of the development of individuals society communities and nations.' অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায় জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রভাব স্থাপন করতে পারে এমন কোনো ঘটনা পরিস্থিতির সুগভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদনই হচ্ছে উন্নয়ন যোগাযোগ। প্লোটো বলেছেন, Communication is winning of men's mind. অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ 'জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণ দ্বারা' যদি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখা। সব উন্নয়ন যদি জনগণের জন্য হয়, তবে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ভূমিকা প্রসঙ্গে ড্যানিয়েল লার্নার ও উইলবার শ্যামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে উইলবার শ্র্যাম

জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রসঙ্গে Mass Media and National Development শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্র্যাম তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন : In the service of national development the mass media are agents of social changes the special kind of social changes, they are expected to help accomplish in the transitions to new customs and practices and in some cases to different social relationship. Behind such changes in behavior much necessarily substantives changes in attitudes, beliefs and skills. অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমই হলো সমাজ পরিবর্তনের প্রতিভূ। এক্ষেত্রে যে বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যাশিত তা হলো আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা সৃষ্টি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের অবতারণা করা। এ ধরনের পরিবর্তন ছাড়াও অবশ্যই মনোভাব, বিশ্বাস, নৈপুণ্য ও সামাজিক আচরণের পরিবর্তন দরকার।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের তাত্ত্বিকরা গণমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহারকে উন্নয়নের অন্যতম বাধা বলে দাবি করেন। তাদের মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই অনুন্নয়নের অন্যতম উপাদান। একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও চেতনার অনড়তা যেমন উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে, তেমনি উপনিবেশবাদ ছিল অন্যতম বাধা, যা পঞ্চাশ-ষাটের দশকের তাত্ত্বিকরা আমলে নেননি। পৃথিবীর সব দেশে উপনিবেশের চিত্র একই রকম। পাক-ভারত উপমহাদেশে

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের তাত্ত্বিকরা গণমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহারকে উন্নয়নের অন্যতম বাধা বলে দাবি করেন। তাদের মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই অনুন্নয়নের অন্যতম উপাদান। একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও চেতনার অনড়তা যেমন উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে, তেমনি উপনিবেশবাদ ছিল অন্যতম বাধা, যা পঞ্চাশ-ষাটের দশকের তাত্ত্বিকরা আমলে নেননি। পৃথিবীর সব দেশে উপনিবেশের চিত্র একই রকম

১৯০ বছরে ব্রিটিশ উপনিবেশ, উগান্ডা ও তিউনিশিয়ায় দীর্ঘদিন ইউরোপীয় উপনিবেশ এবং ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ায় সিডনি বন্দর দখল, এসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। স্পেন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল কিউবা, আলজেরিয়া ও মেক্সিকোতে লুণ্ঠিত পুঁজির মাধ্যমে। দীর্ঘ ৩০০ বছর মেক্সিকো স্পেনের উপনিবেশ ছিল। কিউবা স্পেনের অধীনে ছিল ৪০০ বছর আর আলজেরিয়া ছিল ১১৫ বছর। উপনিবেশ-উত্তর যুগে পর্তুগালের সাবেক লুণ্ঠন ক্ষেত্র ব্রাজিল আজ বিশ্ব অর্থনীতির এক উদীয়মান শক্তি। হংকং থেকে ১৯৯৯ সালে মুছে গিয়েছিল এশিয়া-ইউরোপ শক্তির সর্বশেষ উপনিবেশ।

পর্তুগিজ বণিকেরা চন্দন কাঠের খুঁজে এসে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ পূর্ব তিমুর উপনিবেশ গড়ে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর দ্বীপটি আবার পর্তুগিজদের অধীনে চলে যায়। একসময় পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র দেশটি দখল করে নেয়। অতঃপর ২০০২ সালে পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে। ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ থাকার কারণেই পাক-ভারত উপমহাদেশের দিকে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে বিদেশি শাসকদের দৃষ্টি ছিল। এ দেশে ছিল হরপ্পা মোহেনজেদারুভিত্তিক সমাজ, যা বর্ণভিত্তিক আর্য সভ্যতা এসে পরাভূত করে। প্রচলিত আছে, দ্রাবিড়রা উন্নত হলেও যানবাহনের ক্ষেত্রে ছিল পিছিয়ে। অশ্ব-শকটের ব্যবহার তারা জানত না। এটিও আর্যদের কাছে পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত মহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রথম সূচনা হয়। অতঃপর আফগান ও মোগলরা পর্যায়ক্রমে কয়েক শতাব্দী এদেশ শাসন করে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এই উপমহাদেশে কোনো রকম রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভূখণ্ডগুলো ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত এবং এ দেশের শাসকদের মাঝে পরম শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। রাজা হর্ষবর্ধন যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তার মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রি.) সেই বিশাল সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিদেশি শাসকদের এ দেশে কর্তৃত্ব করার সুযোগ তৈরি হয়। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বঙ্গের রাজা ছিল শশাংক। শশাংকের মৃত্যুর পর দেশে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দিলে গোপাল নামক এ ব্যক্তিকে শাসন কার্যে মনোনীত করা হয়। গোপাল যে রাজবংশ প্রবর্তন করেন, তা পালবংশ নামে খ্যাত।

ঐতিহাসিকদের মতে, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালরা বঙ্গদেশ শাসন করে এবং গোপালের শাসন আমলে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এর পর বঙ্গদেশ সেন রাজাদের শাসনে চলে যায়। এ সময় রাজ্যের আয়ের উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, অনুগত রাজ্যবর্গের কাছ থেকে কর এবং আবগারি শুল্ক কৃষিকাজ ছিল জনগণের প্রধান পেশা। কৃষক তাদের রুটি, রোজগারের নিমিত্তে কঠোর পরিশ্রম করত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকরা বিলাসিতা ও আড়ম্বরের মধ্যে কাল কাটাত।

বহুশতাব্দীতে ভারতের সাথে আরব বণিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তারা ভারতের উপকূলে ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপন করেছিল। ইহুদি লেখক 'জব'র বর্ণনা মতে, আরবরা পশ্চিম ভারত থেকে ওষুধ, মসলা ও সুগন্ধি নির্যাস আমদানি করে তা মিসর ও ফিলিস্তিনে রপ্তানি করত। একসময় সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিসর, ইরান ও পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। ৭০৫ থেকে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়া উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের সিন্ধুও এ সময় মুসলমানদের অধীনে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম শাসন কায়েম করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। এ উপমহাদেশের শাসকদের মাঝে অনৈক্য এবং কুশাসনের ফলে মুসলিম শাসকরা গ্রহণযোগ্যতা পায়। তবে হিন্দু-মুসলমানদের সহাবস্থানের ফলে হিন্দুদের কৌলীন্য প্রথা, পৌত্তলিকতা এবং অস্পৃশ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনেক হিন্দু এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

উপনিবেশের স্থায়িত্ব মূলত নির্ভর করে অধীনস্থ দেশটির ধনসম্পদের ওপর। লক্ষণীয় বিষয় যে, সিন্ধুদেশে আরবদের উপনিবেশ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে, সিন্ধুদেশ কোনো দিনই সমৃদ্ধ ছিল না। এটি ছিল অনুৎপাদনশীল রাজ্য। এ ছাড়া সিন্ধু রাজ্যের রাজপুত্র রাজাদের বিরুদ্ধচারণের কারণেও সিন্ধু আরবদের উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসে।

৭১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু দেশ আরবদের উপনিবেশ ছিল। এর পর বহু বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসকরা পাক-ভারত উপমহাদেশের দিকে আর হাত বাড়ায়নি। নব দীক্ষিত মুসলমান গজনীর তুর্কিরা একসময় পাক-ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলার বাসনা করে। তুর্কিরা ছিল দুর্দমনীয় এবং দুর্ধর্ষ। তারাই একসময় সারা ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত মজবুত করে।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ গঠিত। রাশিয়াকে বাদ দিলে পাক-ভারত

উপমহাদেশ প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান। এ দেশে কমপক্ষে ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচলন থাকায় এই উপমহাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। আর্যদের এদেশে আগমন খুবই তাৎপর্যময়। তারা এশিয়া বা ইউরোপের কোনো এক জায়গা থেকে এসে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে এবং তাদের পরাজিত করে। সাতটি নদীবিধৌত অঞ্চলকে আর্যরা 'সপ্তসিন্ধু' নামে অভিহিত করে এবং একসময় সপ্তসিন্ধু নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। আর্যদের অত্যাচারে এই উপমহাদেশের মানুষ বন-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কিছু অংশ দাসে পরিণত হয়। আর্যদের গাত্রবর্ণ ছিল ফর্সা। তারা ছিল লম্বা এবং খাড়া নাকের অধিকারী। নিজেদের ছাড়া অন্যদের তারা অনার্য বলত। অনার্যদের তারা বলত দস্যু, অসুর ও রাক্ষস এবং অনার্যদের মুখের ভাষাকে বলত 'কাক পক্ষীর বোল'।

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের গোঁড়ার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ করব, গ্রিকরা এ দেশে যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তা সমূলে ধ্বংস করে মৌর্যরা। এই উপমহাদেশ থেকে গ্রিকদের বিতরণ মৌর্যদের একটি অসাধারণ কৃতিত্ব। মৌর্য সাম্রাজ্যের পাঁচশত বছর পর গুপ্ত বংশ ক্ষমতায় আসে। গুপ্ত যুগের পর সেনবংশের ক্ষমতারোহণ এ দেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১২০৪ সালে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি হঠাৎ সেনরাজ্য আক্রমণ করেন মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে, যদিও 'সতের জন সৈন্য' কিংবদন্তিতুল্য তথাপি কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মতে শত শত সৈন্য আগে থেকেই লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ ঘিরে ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের তিনশ' বছর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। ভারতীয় শাসকদের এ সময় বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক দিল্লিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সাতশ' বছর মুসলিম শাসন স্থায়ী হয়। পাকভারত উপমহাদেশে মোগলদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শাসনের অবসান ঘটে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শাসন দুর্বল হয়ে যায়। এই উপমহাদেশের বিপুল সম্পদ, অতুল ঐশ্বর্য যুগে যুগে বিদেশিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একসময় পর্তুগিজ ভারতে আসে এবং তারা এ দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বাণিজ্যের মোড়কে এ দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। গুলন্দাজরা পরে ভারতবর্ষে আসে এবং ভারতের মাদ্রাস ঘাঁটি স্থাপন করে; কিন্তু ইংরেজদের সাথে অচিরেই তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ইংল্যান্ডের রানীর কাছ থেকে ১৫ বছরের একটি বাণিজ্যসনদ জোগাড় করে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকরা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামের একটি বণিক সংঘ গঠন করে।

পর্তুগিজ বণিকদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গুলন্দাজ ও বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্যের নামে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। বাণিজ্য উপলক্ষে যেসব ইউরোপিয়ান ভারতে আগমন করে, তাদের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসি জাতি টিকে যায়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে এই দুই জাতির বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় আসলে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের দণ্ডই প্রাধান্য পায়।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ উপনিবেশের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে বেশ পাকাপোক্তভাবেই। ১৯০ বছর এই উপনিবেশ স্থায়ী হয়। ভারতের আশায় শেষ রশ্মি মহীশূরের টিপু সুলতানের নামে এ দেশের আজাদি আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ১৭৯৯ সালে মালভেলির যুদ্ধে টিপু সুলতান ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপতম রক্ষার্থে বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ হারান তিনি। ঐতিহাসিকদের মতে, বীর টিপু নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য পেলে ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়াতে পারতেন। তখন হয়তো এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। এই উপমহাদেশে প্রায় অর্ধশত বছর ইংরেজ উপনিবেশ কাল টিকে থাকত।

ভারতীয় উপমহাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতি ও বর্ণপ্রথা প্রচলন ছিল। এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণে পাশ্চাত্যে শিক্ষার প্রসার বিরাট ভূমিকা রাখে। এটুকু যদি ১৯০ বছরের উপনিবেশবাদের সুফল বলে ধরা যায় তথাপি পাক-ভারত উপনিবেশের ফলাফল গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যাবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ আর দমননীতির।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ দেশের জনগণ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো সংগঠিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিদ্রোহ করেছে। ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে এ উপমহাদেশের শাসনভার সরাসরি ব্রিটেনের রানীর অধীনে চলে যায়। ১৯০ বছর উপনিবেশকাল কাটিয়ে ১৯৪৭ সালে এই উমপহাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দেশের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের পাথেয় হয়ে থাকবে।

শুধু অর্থনৈতিক শোষণই উপনিবেশকদের মূলে কাজ করেনি। বর্ণবাদ ছিল অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পতন ঘটায়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম সুফল।

আমরা যদি বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে লক্ষ করব ইউরোপের দ্রুত শিল্পায়নের মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণ। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলো থেকে অত্যন্ত চড়া দামে তাদের পণ্য ক্রয় করত এবং ওইসব দেশ থেকে কাঁচামাল আর শ্রমিকের শ্রম কেনা হতো অত্যন্ত স্বস্তায়। এভাবে উপনিবেশবাদীরা তাদের পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলোতে। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম। অন্যদিকে ইউরোপের দেশগুলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হয়েছে। পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ঘটেছে। উন্নত দেশগুলোর আলোকে বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশেও বিগত কয়েক দশকে পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে দেশগুলোতে অসম উন্নয়নের চিত্র ফুটে ওঠে। দরিদ্র দেশগুলোতে একদিকে রয়েছে সম্পদ ও পুঁজির অপর্যাপ্ততা, অন্যদিকে রয়েছে শ্রমাধিক্য।

Unlimited Supply of labors বা lew's মডেলে শহরভিত্তিক শিল্পায়নের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ তা অনুকরণ করেছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। লুইস মডেলে অনুন্নত দেশগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, অনুন্নত দেশে শ্রমের সরবরাহ অধিক বা সচলতা বিদ্যমান। বাস্তবে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশে অসীম শ্রমের সরবরাহ নেই। এ ছাড়া শ্রমের সচলতা প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র দেশে খুব বেশি নেই। কারণ কৃষি খাত থেকে শ্রমিক শিল্প খাতে বা নাগরিক পরিবেশে আসতে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করে। পারিবারিক কিংবা গ্রামের পরিবেশের মায়া কাটিয়ে শহরে আসতে অনেক শ্রমিক অনীহা প্রকাশ করে। শহর এলাকার জীবনধারণের ব্যয়, বাসস্থানের সমস্যা, সাংস্কৃতিক ব্যবধান ও আঞ্চলিক দূরত্ব শ্রমের গতিশীলতার পথে অন্তরায়।

কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে লুইস যেমন কৃষি খাতের তুলনায় শিল্প খাতের সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তেমনি লাইব্রেন্টাইনের 'ন্যূনতম প্রচেষ্টা তত্ত্ব' এবং রোজেন স্টাইল রোডেনের 'বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্বে' শিল্পে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলো মূলত শিল্পের কাঁচামাল প্রস্তুত করে। এই দুই তত্ত্বে বিপুল বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সে পরিমাণ বিনিয়োগ সম্ভব নয়। স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প মূলধন ও কম বিনিয়োগ সুবিধা, উচ্চ জনসংখ্যার চাপ, কম মাথাপিছু আয় ও কম উৎপাদনই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। অধিক বিনিয়োগের জন্য যে দক্ষ শ্রমশক্তি, প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন, তা স্বল্পোন্নত দেশে নেই। বাংলাদেশে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের দৈনিক আয় এক মার্কিন ডলার বা সত্তর টাকা। দেশে প্রতিবছর গড় আয় বাড়ছে। মাথাপিছু আয়ও বাড়ছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকার রয়েছে।

ইউনিসেফের হিসাব মতে, বাংলাদেশে ৮০% লোক কৃষি কাজে যুক্ত। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ রয়েছে। কম দামে মজুরি ক্রয় এবং অধিক মুনাফা লাভ– এটাই পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের প্রধান লক্ষ্য থাকার ফলে বহু শ্রমিক বেকার থাকছে। আশার কথা, সাধারণত জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, দারিদ্র্যের হার কমছে। গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ঘটেছে। প্রসঙ্গত গ্রামের উন্নয়ন ঘটেছে, তবে শহরের অনুপাতে গ্রাম অনগ্রসর।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করে ইউরোপীয় বাণিজ্যবাদের সময় থেকে অসম বিকাশের সূত্রপাত হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশ তথা উপনিবেশবাদী দেশগুলো অসম বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল কাঁচামাল উৎপাদনকারী বা দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সঙ্গে। উদ্দেশ্য উন্নয়ন নয়, শোষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী আক্রমণকারীরা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে আফ্রিকা এবং এশিয়ার কতগুলো দেশ উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। উপনিবেশ ব্যবস্থার ভাঙনের ষোলোকলা পূর্ণ হয় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক

মহাবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে এলেও অনেক দেশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অবদমিত থেকেছে কয়েক দশক ধরে। 'উপনিবেশ শক' দেশগুলোর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যুদস্ত করে রেখেছে।

রিকার্ডো তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে বলেছেন, ইংল্যান্ড বস্ত্র রপ্তানি করবে এবং পর্তুগাল মদ রপ্তানি করবে। উভয় দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভবান হবে। কয়েক শতাব্দী কাল বাণিজ্যের ফলে দেখা গেছে ইংল্যান্ডে উন্নত দেশ এবং পর্তুগাল অনুন্নত দেশই রয়ে গেছে। 'কেন্দ্রপ্রাপ্ত সম্পর্ক তত্ত্বে' বলা হয়েছে কেন্দ্রের মূল বিন্দুতে অবস্থিত সর্বাধিক সম্পদশালী ও সামরিক শক্তিতে বলশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্যের ছত্রছায়াতেই অনেকের বাস। এটা তাই কর্তৃত্বশালী দেশ বা Domination Power মধ্যম সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো, জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি। কম সাম্রাজ্যবাদী অথচ পুঁজিবাদী দেশগুলো বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইতালি, গ্রিস, স্পেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। পরে শক্তিশালী দেশগুলো মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইসরাইল, সৌদি আরব, ইরাক প্রভৃতি। এশিয়া (চীন ও জাপান ছাড়া) আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো দরিদ্র তথা উন্নয়নশীল দেশ।

অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে এবং নগরকেন্দ্রিক শিল্পের বিকাশের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যহীন সৃষ্টি হচ্ছে। পুঁজিঘন প্রযুক্তি কীভাবে অনুন্নত দেশের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, এ বিষয়ে আলোকপাত করেন কতিপয় তাত্ত্বিক। এই তাত্ত্বিকদের মধ্যে আদ্রে ওল্টার ফ্রাংক এবং সামির আমিনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ সংকট নিরসনে ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজির কথা বলেন। ল্যাটিন আমেরিকার শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতিগুলোর শিল্পায়নের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকেই ফ্র্যাংক এই অনুসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উত্তর ব্রাজিলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও বিশেষ করে কোরিয়া যুদ্ধের পর ল্যাটিন আমেরিকার পরিবর্তনশীল উন্নয়ন ধারা মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক। ব্যতিক্রম ল্যাটিন আমেরিকার দেশে আর্জেন্টিনা। শহরকেন্দ্রিক শিল্পোন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রেখেও দেশটি দরিদ্র ও অনুন্নয়ন ঘুচাতে সক্ষম হয়।

পুঁজিঘন প্রযুক্তি ও শোষণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনুন্নত দেশের বেমানান উন্নয়নকে গুল্টার ফ্রাংক যাকে 'অনুন্নয়নের উন্নয়ন' বলেছেন, সামির আমিন মার্ক্সিম চিন্তাচেতনার আলোকে বলেছেন নির্ভরশীল উন্নয়ন (Dependent development)। ষাটের দশকে সাড়া জাগানো গ্রন্থ ই. ই সুমাক্ষার Small is beautiful গ্রন্থে উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে তিনি নতুন চিন্তার অবতারণা করেন। সম্পদ বণ্টন এবং তথ্য বিতরণ বিষয় দুটির ওপর সুরক্ষার অনধিক গুরুত্ব দেন। ফলে উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্ব পায়। আশার কথা, সারা বিশ্বে সত্তর দশক থেকে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রত্যক্ষ নয়, এর সহায়ক ভূমিকা প্রাধান্য পেতে থাকে এ দশক থেকে। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টিও এ সময় থেকে ব্যাপক আলোচনায় আসে। ক্রমে যোগাযোগ ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়ন বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

স্থানীয় জনগণের জীবন পদ্ধতি জানা এবং তাদের জানার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নব্বইয়ের দশকের দিকে PLA (Participatory Learning action), PRA (Pasticipatory Rural Action) টেকনিক বা কৌশল সমধিক গুরুত্ব পেতে থাকে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতে অতি সম্প্রতি স্থানীয় জনগণের চিন্তা, চেতনা, সমস্যা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ কৌশলটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৬১ সালে রিচার্ড হ্যাভার্ড প্রথমে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। PLA প্রসঙ্গে জোহারি ইউনডোতে আমরা লক্ষ করেছি, যারা উন্নয়ন বার্তা দেবেন এবং যারা উন্নয়ন বার্তা গ্রহণ করবেন তাদের এ মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে? যারা বার্তা গ্রহণ করবেন, তাদেরও চেনা বিষয়গুলো দৃষ্টান্ত হিসেবে আসবে। প্রথমত যারা বার্তা দেবেন তাদের কী মেসেজ বা বার্তা আছে এবং যারা বার্তা গ্রহণ করবেন তাদের কাছে কী মেসেজ আছে? যারা বার্তা গ্রহণ করবেন, তারা কী জানে আর কী জানে না– এ বিষয়গুলো যদি উন্নয়নকর্মীর কাছে স্পষ্ট হয়, তবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহজতর হয়।

উন্নয়ন যোগাযোগ কর্মী যখন কোনো একটি বার্তা নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে যাবেন, তখন তাদের ভাবতে হবে তিনিও সাধারণ জনগণেরই একজন, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নন।

উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এই চেতনার আলোকে উত্তর কোরিয়া চীন এবং তাইওয়ানের নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাইওয়ানের কৃষকদের সংগঠন, কোরিয়ার মায়েদের ক্লাব, চীনের আত্মোন্নয়নের সাফল্যের সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কোরিয়ার মায়েদের ক্লাব হাজার হাজার গ্রামে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রথমে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম দিয়ে শুরু হয়েছিল। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি, উৎপাদন, সংরক্ষণ, সমবায় সমিতি, নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কোরিয়ার মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে রয়েছে।

শুরুতে তাইওয়ানের কৃষকদেরও সংগঠন যখন গড়ে ওঠে, তখন ওই দেশটিতে সম্পদের স্বল্পতা ছিল প্রকট। সংগঠন জোরদার হওয়ার ফলে কৃষকদের মাঝে আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা আসে। ১৯৭১ সালে চীনের একটি অংশে জন্মনিয়ন্ত্রণের গ্রুপ প্ল্যানিং শুরু হয়। গণমাধ্যম বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং পরে তা গণসমর্থন লাভ করে। প্রথমে Point to Point কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। Point to Point বিষয়টি বাতি দিয়ে জ্বালানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটি বাতির আগুন দিয়ে আরেকটি বাতি প্রজ্বালিত করে আলোকমালা তৈরি করার মতো। কনফারেন্সে যোগ দেন বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা, যারা গ্রুপ প্ল্যানিংয়ের বিষয়ে অবহিত হন। গ্রামের প্রতিনিধিরা নিজেদের গ্রামে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে গ্রুপ প্ল্যানিং সম্পর্কে আলোচনা করেন। ফলে বেরিফুটেড ডকটরের (গ্রাম্য চিকিৎসক কিন্তু ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) ধারণা জন্ম দেয়। ফলে বিষয়টি সারাদেশে আনুভৌমিকভাবে (Horilantal) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের জনগণ ও গ্রামের প্রতিনিধিদের মধ্যে Intersection বা মিথস্ক্রিয়া এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উন্নয়ন বার্তা গ্রহণের জন্য জনগণের মাঝে যে কৌতূহল, তাও নির্মাণ করেন গ্রামের প্রতিনিধিরা বা অভিমত নেতারা। মূল উপাদান দুটি। একটি হচ্ছে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও অপরটি গ্রুপ ডিনামিক্স। চীনের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় আত্মোন্নয়ন গণমাধ্যমে প্রচার করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামের বঞ্চিত মানুষের মধ্য থেকে অভিমত নেতা (Opinion Leader) চিহ্নিত করার কথাও বলেন কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ। গ্রামের সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতা অনেক। তাঁদের চেনা বিষয়গুলো দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে তাদের মতো করে বোঝাতে পারলে উন্নয়ন বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া সহজ হয়। আশার কথা, বর্তমানে উন্নয়ন গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গুরুত্ব পাচ্ছে। অভিমত নেতাদের বিষয়ে উল্লেখ্য, তাঁরা কোথা থেকে উন্নয়ন বার্তা পান এবং এই বার্তা তারা কার কাছে পৌঁছে দেন, এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে; কিন্তু সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। অভিমত নেতা (Opinion Leader) ধারণাটি চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে জন্ম নেয়। চীনে তখন কমিউনিস্ট ধারা চালু। আন্তর্ব্যক্তিক নেটওয়ার্ক গবেষণার ব্যাপক প্রসার ঘটে ওই সময় থেকে।

বার্তা সিলেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বার্তাটি জনমনে দোলা দেবে, সেটি বিবেচনায় রাখা উন্নয়ন যোগাযোগ কর্মীর একান্ত প্রয়োজন। ধরা যাক, একটি বিশেষ বার্তা যা সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকদের জন্য প্রযোজ্য নয় কিন্তু বার্তা জানা এবং গ্রহণ করার বিষয়টি দরিদ্র-বঞ্চিত লোকের। সেক্ষেত্রে বার্তা সিলেকশন বা নির্বাচন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' এই PSA (Public Service Announcement) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সুখ বিষয়টি আপেক্ষিক। এক্ষেত্রে ছোট পরিবার সচ্ছল পরিবার। এই PSA নিয়ে যেতে হবে দরিদ্র-বঞ্চিত জনগণের কাছে। যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা আট থেকে ১০ জন। সমাজের উচ্চশ্রেণিতে পরিবারের আকার ছোট অথবা তারা অনায়াসেই উচ্চ জীবনযাপনের ব্যয় মেটাতে পারে। তাই তাদের কাছে পরিবার পরিকল্পনা বার্তা অর্থহীন মনে হবে। অথচ লক্ষ করা যায়, আমাদের দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কর্মীরা ঢালাওভাবে সবার বাড়ি যাচ্ছে এবং নিজেরা ক্ষেত্রবিশেষ অসহযোগিতা পাচ্ছে এবং অন্যের বিরক্তির কারণ ঘটাচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চীনের প্রসঙ্গে আসা যাক। চীনের জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল বিষয়টি ছিল লক্ষণীয়। তখন একজন দম্পতির একটি সন্তান কাম্য ছিল। ফলে এ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছিল। শুধু ওপর থেকে আইন করে চাপিয়ে দিলে জনগণের মাঝে সেটি গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি চীনে একাধিক সন্তান অনেক মায়েদের কাম্য। এ নিয়ে চীনা প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ জনগণের বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। চীনের জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুন্নত বিশ্বে অনুকরণীয়, ঢালাওভাবে এখন মন্তব্য করা যাবে না। যে কোনো কর্মপরিকল্পনা তারা বাস্তবায়নকালে জনগণকে সেই কর্মের উপযোগিতা কী, সে সম্পর্কে সঠিকভাবে বোঝানোর পরিবেশ আগে তৈরি করতে হবে। একথা আমাদের মানতে হবে যে গণঅংশগ্রহণের মাঝেই কর্মোদ্যোগের সফলতা নিহিত আছে।

লেখক : উপ-পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

উন্নয়ন যোগাযোগ সৌধ, সৌন্দর্য ও ভিত্তি

খান মো. রবিউল আলম

যোগাযোগ ও উন্নয়ন আন্তঃসম্পর্কিত। যোগাযোগ তাত্ত্বিক উইলবার শ্র্যাম বলেছেন, যোগাযোগ হলো একটি মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যা পরিবর্তনে অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে কাজ করে।[১] উন্নয়ন অনেকগুলো অনুষঙ্গের সমষ্টি। এসব অনুষঙ্গের পারস্পরিক শক্ত বুননে যোগাযোগ প্রধানতম নিয়ামক। যোগাযোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। শ্র্যাম আরও বলেন, যখন কোনো সমাজে উন্নয়ন বা পরিবর্তন ঘটে, তখন সেখানে যোগাযোগ প্রবহমান থাকে।[২]

বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণযোগাযোগের প্রায়োগিক ধরন হিসেবে উন্নয়ন যোগাযোগের বিকাশ ঘটে। ... ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে এবং উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করে

যোগাযোগ নিরন্তর প্রবহমান ধারা। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগের পদ্ধতিগত ব্যবহার নিয়ে বেশ সমালোচনা আছে। অনেকে বলতে চান, যোগাযোগ এত নিবিড় ও চলমান প্রপঞ্চ যে একে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা সঠিক নয়। অর্থাৎ যোগাযোগকে আলাদা করা যায় না বা মোড়কীকরণ করে ব্যবহার করা যায় না। যোগাযোগকে যারা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন, তাদের মধ্যে এমন মনোভঙ্গি প্রাধান্যশীল। অন্যদিকে যোগাযোগকে যারা বাণিজ্যিক বা উন্নয়নের প্রেক্ষিত থেকে দেখেন তারা মনে করেন, পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের যান্ত্রিক বা কৃৎকৌশলগত ব্যবহার হচ্ছে এবং উৎকর্ষ দিন দিন বাড়ছে।

বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণযোগাযোগের প্রায়োগিক ধরন হিসেবে উন্নয়ন যোগাযোগের বিকাশ ঘটে। এ সময় আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে এবং উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করে। এসব দেশের সামনে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্ব দূরের মাধ্যম জনগণের জীবনমান উন্নয়ন প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় থেকে দেশগুলোয় পশ্চাৎপদ নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তথ্য ও গণযোগাযোগের পদ্ধতিগত ব্যবহার শুরু হয়। যোগাযোগ সম্পর্কিত কলা ও বিজ্ঞানের এ সমন্বিত ব্যবহার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভূমিকা সব সময় এক থাকেনি। সময়ান্তে এ ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। বিগত দশকগুলোয় উন্নয়ন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি প্যারাডাইমের উদ্ভব ঘটেছে। একাধিক তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে এসব স্বতন্ত্র প্যারাডাইম গড়ে ওঠেছে। প্রথমত, ডমিনেন্ট প্যারাডাইমে যেখানে উন্নয়নকে দেখা হয়েছে মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন প্রেক্ষিত থেকে। ডমিনেন্ট প্যারাডাইমে যোগাযোগের ভূমিকাকে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে। ডমিনেন্ট প্যারাডাইমে যোগাযোগ মডেলটি ছিল মূলত এক রৈখিক, কার্য-কারণ-ফলাফলনির্ভর।[৩] ডমিন্যান্ট প্যারাডাইমে যোগাযোগের ভূমিকা নিয়ে ড্যানিয়াল লার্নার বলেন, গণমাধ্যম সামাজিকীকরণে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সামাজিক পরিবর্তনে এর বহুমাত্রিক জাদুকরি ক্ষমতা রয়েছে। তার মতে, গণমাধ্যম উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে সহায়ক আবহ তৈরি করে। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যম উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সামাজিক পরিবর্তনে অন্যতম ক্রীড়নক। তার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে আরেক যোগাযোগের তাত্ত্বিক ইভারেট এম. রজার্স বলেন, জনগণের কাছে তথ্য ও প্রভাবকমূলক বার্তা বিস্তরণের জন্য গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[৪]

ডমিনেন্ট প্যারাডাইম ছিল মূলত গড় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিকেন্দ্রিক, যা ছিল পরিসখ্যাননির্ভর। অল্টারনেটিভ প্যারাডাইম হলো মূলত গুণগত পরিবর্তননির্ভর। অল্টারনেটিভ প্যারাডাইম অনেক বেশি মানবিক, মূল্য নির্দেশিত এবং বহুমুখী। ৬ অল্টারনেটিভ মডেলে আত্মোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়ন মানে কেবল সংখ্যাগত পরিবর্তন নয়, এটি হলো গুণগত পরিবর্তন। জীবনমানের পরিবর্তন। উন্নয়নের সফলতা নির্ভর করে চাহিদা ও অধিকারের ওপর। ডমিনেন্ট প্যারাডাইমে যোগাযোগ ছিল এক রৈখিক, যা ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হতো। আর অল্টারনেটিভ প্যারাডাইমে যোগাযোগের ভূমিকাকে দেখা হয় তৃণমূল প্রেক্ষিত থেকে। এ যোগাযোগ স্কিমে গণমাধ্যম ও দেশজ উভয় মাধ্যম ব্যবহারের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইভারেট এম রজার্স অল্টারনেটিভ প্যারাডাইমে যোগাযোগের ভূমিকাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:

১. স্থানীয় চাহিদা, সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে উন্নয়ন তথ্য বিচ্ছুরণ করতে হবে;

66

অপরদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিক সচেতনতার জন্য কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট বা সিফরডি শিরোনামে উন্নয়ন যোগাযোগের আরেকটি প্যাটার্ন অনুসরণ করছে। এ সিফরডির আওতায় কী কী কর্মসূচি পরিচালিত হবে, তা প্রকল্প বা প্রোগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে

99

দ্বিতীয়ত, ডিপেনডেন্সি মডেলে বলা হয়েছে, দরিদ্র দেশগুলোর অনুন্নয়ন উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে যোগাযোগের ভূমিকায় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়েছে।[৫] এখানে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমাকরণ উৎসাহিত করা হয়, যা আধুনিকায়নের রাস্তা ধরে আসবে বলেই অনুমিত ছিল। ডিপেনডেন্সি মডেলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল মূলত গণমাধ্যমের প্রাধান্যশীল ভূমিকা এবং প্রভাবকে স্বীকার করে একে পরিবর্তনে প্রতিভূ বিবেচনা করে টপডাউন অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া। তৃতীয়ত, অল্টারনেটিভ বা বিকল্প বা অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচ হলো মূলত স্থানিক ও কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা, যেখানে জনঅংশগ্রহণ ও তৃণমূল থেকে ওপরের দিকে আসে এবং উন্নয়নের জন্য 'মিনিং শেয়ার' করা হয়। এ মডেলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে। এ প্যারাডাইমে মনে করা হতো, উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় তাদের মূল্যবোধগুলো চাপিয়ে দিতে চায়। যা হোক, উন্নয়নে মিডিয়ার ব্যবহার, বার্তা তৈরি ও জানানোর কৌশল বিষয়ে এ সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অল্টারনেটিভ প্যারাডাইমের জন্ম দেয়।

২. ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য বিস্তরণ করতে যাতে গ্রুপের সদস্যরা একে অন্যের কাছ জেনে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমদক্ষতা অর্জন করতে পারে।[৮]

রজার্সের বক্তব্যে যোগাযোগের বিচ্ছুরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তার এ ধারণায় উন্নয়ন যোগাযোগের সব অনুষঙ্গ ধরা যায় না। কারণ বিচ্ছুরণবাদী মডেল যা ছিল মূলত গণমাধ্যমবাহিত ও আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের সমন্বয়, যেখানে ধারণা করা হয়েছিল চূড়ান্তভাবে প্রযুক্তির অভিযোজন ঘটিয়ে তথ্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটবে। উন্নয়ন যোগাযোগ তাত্ত্বিক জুয়ান এফ. জামিয়াস বলেছেন, উন্নয়ন যোগাযোগের কাজ হলো তথ্য বা বার্তার গ্রহীতাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা, যা রজার্সের সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জুয়ানের বক্তব্য অনুসারে উন্নয়ন যোগাযোগ ফলাফলনির্ভর। ফলাফল অর্জন না হওয়া পর্যন্ত একে উন্নয়ন যোগাযোগ বলা যায় না।[৯] আর উন্নয়ন যোগাযোগের এ ফলাফল মাপা হয় ব্যক্তির জ্ঞান, আচার-আচরণ ও অনুশীলনে কী পরিবর্তন ঘটল তার ওপর। উন্নয়নকে গতিশীল করতে গণমাধ্যমের ম্যাজিক মাল্টিপ্লেয়িং ভূমিকার কথা বলা হয়। উন্নয়ন যোগাযোগ তাত্ত্বিক নোরা সি কুইব্রালের বলেন, 'উন্নয়ন যোগাযোগ হলো

এমন কলা ও বিজ্ঞান, যা সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়, যেখানে দারিদ্র্য দূর করে গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা এবং মানুষের সম্ভাবনার সর্বোত্তম বিকাশ নিশ্চিত হবে।' ১০

উন্নয়ন দর্শনের পরিবর্তন বা উন্নয়ন যোগাযোগ ধারণা আত্মস্থকরণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে যত মতভেদ থাকুক না কেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগের অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এজন্য নিজস্ব যোগাযোগ দর্শন অনুধ্যানের কোনো বিকল্প নেয়। যে কোনো উন্নয়ন উদ্যোগের অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য হলো সে জনগোষ্ঠীর যোগাযোগীয় মনোভঙ্গি ও অভ্যাসের রূপ খুঁজে দেখা। একই সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব সাংস্কৃতিক যোগাযোগীয় কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনের ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারা। স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান উন্নত যোগাযোগ মূল্যবোধগুলো কতটা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে ছাঁকনি দিয়ে বের করা বা কাছে লাগানো যাচ্ছে, তা যোগাযোগ পেশাজীবীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জের বিষয়। উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

স্পিরিচুয়ালিটি বা ভাবের উন্নয়ন একটি মহাক্ষেত্র, যা সব উন্নয়নের অন্যতম পাটাতন। এ স্পিরিচুয়ালিটি বা ভাব হলো মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যে যে সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও সহ বস্থান, তার গূঢ় দিক। মানবিক বা সামাজিক সম্পর্কের আস্থা ও সম্পর্কের বুনন ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না। এক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগের একটি নতুন স্কিম হিসেবে বাঙালি ব্রাত্যজনদের অসাম্প্রদায়িক চিন্তা, চেতনা, চর্চা ও তার সারবত্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগ কৌশল উদাহরণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য স্কিম আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। দক্ষতার সঙ্গে সেগুলো বের করে উন্নয়ন যোগাযোগের বহুমাত্রিক রূপ চিহ্নিত করা সম্ভব।

বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগের কার্যকর ব্যবহার নিয়ে বলার মতো অনেক সাফল্য আছে। বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) মডেল এবং পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক ও প্রশিকাসহ অন্য বেসরকারি সংস্থাগুলো উন্নয়ন যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।১১ সর্বোপরি এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে একটি 'ক্রিটিক্যাল ম্যাস' তৈরি হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নয়ন যোগাযোগের সফল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা, সম্প্রসারিত ঠিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়া রোধে খাবার স্যালাইন, বৃক্ষরোপণ, আর্সেনিকমুক্ত পানি এবং বাল্যবিয়ে ও পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা।

অপরদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিক সচেতনতার জন্য কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট বা সিফরডি শিরোনামে উন্নয়ন যোগাযোগের আরেকটি প্যাটার্ন অনুসরণ করছে। এ সিফরডির আওতায় কী কী কর্মসূচি পরিচালিত হবে, তা প্রকল্প বা প্রোগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান ইনোভেশন বা নতুন নতুন প্রোটোটাইপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে। তবে যোগাযোগ পরিকল্পনায় মিডিয়া ও মেসেজের ধরন, প্রকৃতি, জনসম্পৃক্ততা ও কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণা প্রচেষ্টা খুব সীমিত। মিডিয়া বা বার্তা নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি লক্ষণীয়। অনেক সময়, সাধারণ জনগণের বোঝাপড়ার সক্ষমতাকেও হালকা করে দেখা হয়। ফলে বার্তার সরলীকরণ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বাস্তবতা বিবেচনায় সাধারণ মানুষের বোঝার সক্ষমতা নিয়ে সংশয় প্রকাশের কোনো সুযোগ নেয়। সাধারণ মানুষের বোঝাপড়া ও চাহিদার আলোকে উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে উন্নয়ন আবহটা তৈরি করা গেলে তা জুতসই হতো। এক্ষেত্রে বাইরের মূল্যবোধের বিনিময়মূলক সম্পর্কটা আরো দৃঢ় হতো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উন্নয়ন যোগাযোগের মাধ্যম ও বার্তার সিংহভাগ আরোপিত। ফলে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন অ্যাপ্রোচে উন্নয়ন যোগাযোগের কৃৎকৌশল ব্যবহারে স্থানীয় বাস্তবতা, লোকজ জ্ঞান ও মিডিয়া বিষয়ে যে নির্দেশনা আছে, তা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এ দেশের মাটিতে যে বোধ, জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটেছে তার প্রায়োগিক ব্যবহারটা যৎসামান্য ঘটেছে।

যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষত মোবাইল ফোন, গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে দেশব্যাপী আন্তঃসংযোগ আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ দক্ষতা অনেক বেড়েছে। তথ্য সংগ্রহ, ধারণ, বিন্যাস ও বলার ভঙ্গিতে প্রান্তজনের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে। সাধারণ পথেঘাটেও আজ দারুণ সব স্টোরি টেলর পাওয়া যায়। 'পাবলিকলি সাই' জনগণের সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে যে লজ্জাবোধ ছিল তা ভেঙেচুরে যাচ্ছে। এখন সবার মধ্যে দারুণ বাকস্পৃহা। এটা উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। বলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ দারুণ দক্ষতা অর্জন করেছে। নিজের মতো করে আবেগ মিশিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে। বলার সময় বাচনিক ও অবাচনিক যোগাযোগের দারুণ মিশেল ঘটায়। লক্ষ করা যায়, চোখে চোখ রেখে আস্থার সঙ্গে মানুষ কথা বলে। ক্ষেত্রবিশেষ পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ধারণাকে প্রাতিষ্ঠা করে। জনমানুষের আরগুমেনটেটিভ পাওয়ারও অনেকাংশে বেড়েছে। অনেক বড় বড় বিষয়কে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে মানুষ যে যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করেছে, উন্নয়নের সার্বিক সূচকে তার অনবদ্য ভূমিকা ও সংযোগ রয়েছে। যোগাযোগ দক্ষতাকে ঘিরে সমাজের যে 'গ্রান্ডপার্সনালিটি' তৈরি হয়েছে, এটাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। মানুষের এ সহজাত অর্জনের সঙ্গে উন্নয়ন যোগাযোগের কার্যকর মিশেল ঘটলে তা অবশ্যই ভিন্ন উচ্চতা তৈরি করবে।

আরোপিত যোগাযোগ দর্শন দিয়ে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা তৈরি বা এর স্থায়ী রূপ দেওয়া যায় না। কার্যকর উন্নয়ন বাতাবরণ তৈরি করতে হলে মাটি ও মানুষ অধ্যায়ন জরুরি। ব্যাপারটি যোগাযোগ পেশাজীবীর শ্রেণিচৈতন্য বা বোঝাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একজন যোগাযোগ পেশাজীবী তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পটভূমিকে কীভাবে দেখছেন অর্থাৎ যোগাযোগের সারবত্তাগুলো কীভাবে বের করছেন, আত্মস্থ করছেন ও প্রয়োগ করছেন, তার ওপর উন্নয়ন যোগাযোগের সৌধ, সৌন্দর্য ও ভিত্তি নির্ভর করছে।

রেফারেন্স:

1. Scharmaa quoted by Rahman Golam M.(1999); Communication Issues in Bangladesh; Har-Anand Publications Pvt. Ltd. In association with Paragon Publishers, Dhaka, Bangladesh
2. Daniel Learner and Scharmm Wilbur(ed.) (1967); Communication and Development in the Developing Countries; East-West Centre Press, Honolulu
3. The Journal of Development Communication; No.1 Vol.7, June 1996; Kuala Lumpur, Malaysia
4. Ibid
5. Ibid
6. Ibid
7. Ibid
8. Melkote Srinivas R(1991); Communication for Development in the Third World; Sage Publication India Pvt. Ltd. New Delhi
9. Jamias Juan F.(1975); Reading in Development Communication; Department of Communication College of Agriculture, University of the Phillines
১০. https://www.slideshare.net/TatendaChityori/9-development-communication
11. Perception of Effective of Communication Media and Messages Used by BRAC for Rural Development: A Study on Village of Bangladesh(2001); Unpublished Master Thesis Conducted by Khan Md. Rabiul Alam under the Department of Mass Communication University of Rajshahi

লেখক: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং

শুভ কর্মকার

প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে ইচ্ছামতো। জীবনধারার পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে প্রকৃতির ব্যবহার মানবসভ্যতার টিকে থাকাকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন পড়েছে পরিবেশবান্ধব পরিবর্তনের। টেকসই উন্নয়নের ধারণা পরিবেশ সহায়ক ইতিবাচক পরিবর্তন থেকে বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের অন্যতম আলোচনা টেকসই উন্নয়ন। বিশ্বনেতারা টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বদ্ধপরিকর বিশ্বের

টেকসই উন্নয়নের ধারণা পরিবেশ সহায়ক ইতিবাচক পরিবর্তন থেকে বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের অন্যতম আলোচনা টেকসই উন্নয়ন

১৯৩টি দেশ। বাংলাদেশ এই ১৯৩টি দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ এখনো উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে পারেনি। তাই দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম অংশ হলো উন্নয়ন যোগাযোগ। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নয়ন প্রকল্প, উন্নয়ন ফলাফল, উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতি, অনিয়ম, সাফল্যের সংবাদসহ সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে ষাটের দশকের দিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন ঘটে। আশির দশকের শেষদিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বাংলাদেশের সাংবাদিকতা চর্চাকে আলোড়িত করে (লিপন, ২০০০)। একবিংশ শতাব্দীতে এসে যুগের সঙ্গে তাল রেখে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে ঝুঁকেছেন। কিন্তু এখনো টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে তেমন কোনো পাঠ গড়ে ওঠেনি। একথা ঠিক, সাংবাদিক তার 'সংবাদ' এর শক্তিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সহায়ক হতে পারে। আর এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে হতে হবে চৌকস। বাংলাদেশের মতো সম্ভাবনাময় দেশকে উন্নতর পর্যায়ে নেয়ার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং সমকালীন আলোচনার দাবিদার। এই নিবন্ধে টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, টেকসই উন্নয়ন সাংবাদিকতা,

টেকসই উন্নয়ন রিপোর্টিংয়ের ধরন, টেকসই উন্নয়ন রিপোর্টিংয়ের বিবেচ্য বিষয়, টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সাত নীতিমালা, ভালো টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদন লেখার উপায় সীমিত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন ধারণা

একুশ শতকের শুরুতে বিশ্বনেতাদের প্রধান আলোচনা ছিল বিশ্ব টেকসইয়ের সমস্যা। সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং নাগরিকদের মাঝে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ২০০২ সালের টেকসই উন্নয়নের ওয়ার্ল্ড সামিট থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের লক্ষ্য হবে ভূমণ্ডলকে মানব বাস-উপযোগী করে তোলা। ১৯৬৯ সালে আইইউসিএন কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন ধারণা সামনে নিয়ে আসারও ৩০ বছর আগে এই ধারণার উৎপত্তি হয়। (Adams, 2006)। জাতিসংঘের ১৯৭২ সালের কনফারেন্সের মূল থিমই ছিল: 'Human Environment' (McCormick, 1992)। পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন ছাড়াই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শিল্পায়ন সম্ভব– এই ধারণা থেকে টেকসই উন্নয়ন ধারণার উৎপত্তি হয়। দশকের পর দশক টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞার কলেবর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দ্য ব্র্যান্ডটল্যান্ড রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: 'Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs' (Brundtland, 1987)। এসএম লিলি এই সংজ্ঞাটিকে অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করেন (Lélé, 1991)। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরা হয়। ১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা; ২. দারিদ্য দূর করতে এখনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন।

অর্থাৎ পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে উন্নয়ন ধারণা থেকেই টেকসই উন্নয়ন প্রত্যয়ের জন্ম। প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান, তারই স্বীকৃতি 'টেকসই উন্নয়ন' প্রত্যয়। (ভট্টাচার্য এবং হোসেন, ১৯৯৯, পৃ. ৯৬)। টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে হলে প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন পড়ে। আর সম্পদের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে শিল্প ও কৃষি থেকে। কিন্তু শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে সেখান থেকে প্রচুর দূষণের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভূত দূষণ ইকো ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতির সম্পদ পুনঃব্যবহারের নিজস্ব বদ্ধচক্র ভেঙে যাচ্ছে। প্রখ্যাত জীববিদ ব্যারি কামনার তাঁর বিখ্যাত বই ক্লোজিং সার্কেলের ইকোবিদ্যার চারটি জনপ্রিয় নিয়ম সূত্রবদ্ধ করলেন এভাবে (কামনার, ১৯৭১):

ক. সবকিছুই সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত
খ. কোনো বস্তুই বিলীন হয়ে যায় না
গ. প্রকৃতিই সবচেয়ে ভালো জানে
ঘ. বিনামূল্যে ভোজন বলে কিছু নেই, অর্থাৎ সবকিছুর জন্য মূল্য দিতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন ইকোবিদ্যার চতুর্থ নিয়মটিরই সম্প্রসারিত তত্ত্ব। নব্যধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানীরা বলেন,'development in terms of the maintenance of percapita consumption across all generation' (ভট্টাচার্য ও হোসেন, ১৯৯৯)। ব্রিটিশ পরিবেশ অর্থনীতিবিদ টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা দেন এভাবে: 'sustainable development involves maximising the net benefits of economic development, subject to maintaining the service and quality of natural resources over time'. (Turner, 1988)।

টেকসই উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলো World Commission on Environment and Development (WCED) কর্তৃক প্রকাশিত Our Common Future গ্রন্থ থেকে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো (WCED, 1987):

- আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণ
- মানুষের বাঁচার প্রয়োজন- খাদ্য, শক্তি, বাসস্থান, জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি
- জনসংখ্যাকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় ধরে রাখা
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভোগ
- জৈব সম্পদ এমন হারে আহরণ করা, যা প্রকৃতি সেই সময়ে পুনর্বিকিরণ করে
- শক্তির ক্ষেত্রে পুনর্বিকিরণ উৎসের ওপর নির্ভর করা
- খনিজসম্পদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং রিসাইক্লিংয়ের ওপর জোর দেয়া
- সুষম ভূমি ব্যবহার ও তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনা
- জল ও বায়ুদূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনা
- গ্রাম উন্নয়নের ওপরে জোর দেয়া, যাতে গ্রামের মানুষ নিরন্তর শহরের দিকে না আসে
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া, যাতে গ্রামের মানুষ নিরন্তর শহরের দিকে না আসে
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া
- যুদ্ধনীতি থেকে বিশ্বকে বিরত করে পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণায় জোর দেয়া; এবং
- সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থা করা। (রায়, ১৯৯১)।

টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সেটা হলো:

প্রথমত, প্রসার উপাদান। যার অর্থ হলো, জনসংখ্যার সবার জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্য এবং সেবাসামগ্রীর চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়ত, পুনর্বণ্টনগত উপাদান। যার অর্থ হলো, আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা।

তৃতীয়ত, পরিবেশগত উপাদান। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশগত প্রভাব এবং ইকো পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। (ভট্টাচার্য, হোসেন, ১৯৯৯)।

টেকসই উন্নয়ন তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ তিনটি হলো: পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সমাজ। টেকসই উন্নয়নের তিন স্তম্ভের মডেলটি ১৯৭৯ সালে অর্থনীতিবিদ রেনে পাসেট প্রাথমিক প্রস্তাব দেন। মডেলটির ছবিটি ছিল এরকম:

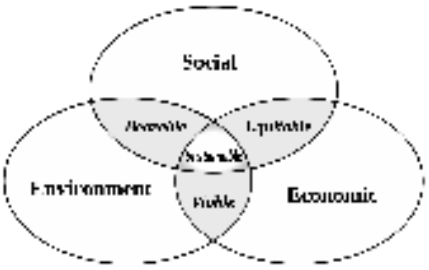

চিত্র: টেকসই উন্নয়ন মডেল (Passet, 1979)

মডেলটিতে দেখা যাচ্ছে, সমাজ ও পরিবেশ পৃথিবীকে সহনীয় অবস্থায় নিয়ে আসবে, পরিবেশ ও অর্থনীতি সফলভাবে কাজ করার সক্ষমতা তৈরি করবে, অর্থনীতি ও সমাজ ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরি করবে। কিন্তু সমাজ, পরিবেশ ও অর্থনীতির সম্মিলনই একমাত্র টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। রেনে এই মডেলের তিনটি উপাদান যথা: সমাজ, পরিবেশ এবং অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে যুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

'কাউকে পেছনে ফেলা নয়'– এ স্লোগানকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রন্ত লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) উত্তরসূরি হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয় জাতিসংঘ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০৩০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো (খান, ২০১৬):

১. দারিদ্র্যবিলোপ: সরকারের দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য মোকাবিলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা।

২. ক্ষুধামুক্তি: পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় কৃষি ও সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর ও স্থানীয় খাদ্য মজুদের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একই সাথে, সেচব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধারের ধারণক্ষমতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর ব্যবহার কমিয়ে একটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারী ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা: শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের জন্য টেকসই, কল্যাণকর জীবন ও জীবিকার সুযোগ এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তৃণমূল পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. নারী-পুরুষ সমতা: নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন: পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সবার জন্য বিশেষ করে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি: বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ এবং টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা।

৮. যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে টেকসই ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যক্তির ও সমাজের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের পরিবেশ ও সমাজবান্ধব জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো: মানববসতি, কৃষিজমি, বন, পাহাড় ও জলাশয়সহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত রেখে বাড়িঘর নির্মাণ ও শিল্প অবকাঠামো স্থাপনে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা।

১০. অসমতা হ্রাস: অপেক্ষাকৃত বেশি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলসমূহে উন্নয়ন ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও জীবনমানের অসাম্য দূর করা।

১১. টেকসই নগর ও সমাজ: পরিকল্পিত বসতি স্থাপন, টেকসই ও পরিবেশসম্মত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানববসতিসমূহকে নিরাপদ, প্রতিকূলতা সহনীয় এবং টেকসই করে তোলা।

১২. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন: প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভোগ্যপণ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন এবং ব্যবহার টেকসই করার লক্ষ্যে এ সকল সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু কার্যক্রম: জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সকল ঝুঁকি প্রশমন করে স্থানীয় রীতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন টেকসই জীবনাচার পালনে সমাজের সকলকে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪. জলজ জীবন: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও ব্যবহার বিবেচনা করে মৎস্য ও উদ্ভিজ সম্পদসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণী এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সম্পদ ও প্রাকৃতিক উপাদানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

১৫. স্থলজ জীবন: প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: স্থানীয় বায়ুমণ্ডল, জলাধার, বনাঞ্চল, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিকতা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, পুনঃসৃজন এবং এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে এমন সমাজব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যেখানে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমঅধিকার, জবাবদিহিতা, বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সরল জীবনযাপনের সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

১৭. লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব: সামাজিক কার্যক্রমে সমাজের সকল পর্যায় ও আন্তঃআঞ্চলিক অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, আন্তঃআঞ্চলিক (এলাকা) সম্পর্ক উন্নয়ন করা, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে উন্নয়ন টেকসই হয়।

টেকসই উন্নয়ন সাংবাদিকতা

মুক্ত, বহুত্ববাদী এবং স্বাধীন গণমাধ্যম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য। জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে সমস্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার প্রক্রিয়াই টেকসই উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নপূর্ব, বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নপরবর্তী রিপোর্টসহ কর্মসূচির বিকল্প চিন্তা চেতনা নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অন্যান্য প্রতিবেদনের মতো এখানেও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়।

সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদিত কর্মই সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদন প্রক্রিয়া আলোচনার ক্ষেত্রে আমেরিকার সিটি ইউনিভার্সিটির স্কুল অব জার্নালিজমের অধ্যাপক জেফ জারভিস কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলো:

The new news process

জেফ জারভিসের সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে তিনটি ধাপ লক্ষ করা যায় যথা: সংবাদ প্রতিবেদন লিখন পূর্ববর্তী, সংবাদ লিখন, সংবাদ প্রকাশপরবর্তী ধাপ। সংবাদ লিখন পূর্ববর্তী স্তরের মধ্যে রয়েছে সংবাদবিষয়ক ধারণা, আলোচনা এবং প্রশ্ন। সৃষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তরের সন্নিবেশ ঘটবে সংবাদে। প্রশ্ন এবং উত্তরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। এছাড়া ঘটনা এবং ঘটনাস্থল সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থাকবে রিপোর্টে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে লেখা হবে নিউজ স্টোরি বা সংবাদ প্রতিবেদন। এই সংবাদ প্রতিবেদন পাঠক এবং সংবাদপত্রের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে। সংবাদপত্র এবং পাঠকের যোগাযোগ সংবাদ প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য, সংশোধন তৈরি করবে। যার ফলে একটি ফলো-আপ প্রতিবেদনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এছাড়া সংবাদ প্রতিবেদন সম্পর্কিত মন্তব্য প্রতিবেদককে পরবর্তী সময়ে আরো ভালো প্রতিবেদন লিখতে সহায়তা করবে।

সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ লেখা ও প্রকাশ পর্যন্তই রিপোর্টারের দায়িত্ব নয় বরং সংবাদ প্রকাশপরবর্তী মন্তব্য ও ফলো-আপ প্রকাশ করাও সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার অংশ। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে এই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখতে হয়। তবে এক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টারকে কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। ১. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো সম্পর্কে রিপোর্টারকে শতভাগ মনোযোগী হতে হবে। ২. লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত ফলাফলের দিকে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে রিপোর্টার বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি ট্র্যাকার ওয়েবসাইটকে অনুসরণ করতে পারেন (http://www.sdg.gov.bd)। সেখান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে সাদামাটা অথবা গভীর প্রতিবেদন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদনের ধরন

উন্নয়ন শব্দটির অর্থ হলো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। আর মানুষের জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়েই উন্নয়ন সাংবাদিক প্রতিবেদন

লিখে থাকে। ফিলিপাইনের লোস বার্নোস বিশ্ববিদ্যালয়ের নোরা সি. কেব্রাল অথবা উন্নয়ন সাংবাদিক টার্জি ডিটাচি এই ধারার সাংবাদিকতার সূচনাকারী হিসেবে মনে করেন, 'দরিদ্র দেশগুলোতে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেসবের বাস্তবায়ন-পূর্ব, বাস্তবায়নকালীন এবং পরবর্তী প্রসঙ্গসমূহের প্রতিবেদন নির্মাণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর বিকল্পসমূহ প্রকাশ করা উন্নয়ন সাংবাদিকতা' (উদ্ধৃত লিপন, ২০০০)। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রিপোর্টারকে বাস্তবায়নপূর্ব, বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নপরবর্তী সাদামাটা এবং গভীর প্রতিবেদন করতে হয়। বিশেষ করে অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করে। সাদামাটা ও গভীর প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে কয়েক ধরনের রিপোর্ট করতে হয়। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে ইউনেস্কো কয়েক ধরনের রিপোর্টের কথা বলে। রিপোর্টগুলো হলো (Banda, 2015):

ক. ইকো-সাংবাদিকতা: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ইকো-সাংবাদিকতা। বিশ্বে সাংবাদিকরা নিশ্চিত যে, আধুনিকতার কারণে বিশ্ব পরিবেশ আজ সংকটাপন্ন। যে কারণে সমকালীন গণমাধ্যমে ইকো-সাংবাদিকতা অধিক গুরুত্বের দাবিদার। ইকো-সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত হবে পরিবেশ, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক রিপোর্টিং। রিপোর্টারকে এই বিষয়গুলো নিয়ে গভীর প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, প্রকৃতি এবং সমাজ সম্পর্কে রিপোর্টারকে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রিপোর্টারকে আরো জানতে হবে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে ইকো-সাংবাদিকতা সম্পর্কিত কোন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করছে। সেই মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং বিভাগে সবসময় নজর রাখতে হবে। এখানে একটি উদাহরণ দেয়া হলো: টেকসই উন্নয়নের ৩ নম্বর লক্ষ্য হলো সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অধিকাংশ দায়িত্ব প্রদান করেছে। এছাড়াও লক্ষ্য অর্জনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ দায়িত্বে রয়েছে (খান, ২০১৬)। সেই সাথে সহযোগী অনেকগুলো মন্ত্রণালয় এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। রিপোর্টারকে অবশ্যই এই মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতি সার্বক্ষণিক নজর দিতে হবে। লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রকল্প ও ইস্যুগুলোর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদন করতে হবে।

খ. টেকসই ট্যুরিজম: টেকসই ট্যুরিজম ধারণাটি গঠিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকে। ফ্যাশেনেবল ধারণা এবং গত দশকের পুরাতন বাস্তবতা, ব্যবসায়িক স্লোগান এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, উত্তর এবং দক্ষিণের ভিন্ন মত, একাডেমিক চিন্তা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বান্দ্বিক অবস্থান টেকসই ট্যুরিজম ধারণা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। টেকসই ট্যুরিজম ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করা একই সাথে জটিল এবং সহজ। সহজ কারণ, শতাব্দীর শুরু থেকে ট্যুরিজম প্রত্যয়টি অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু বেশি ব্যবহৃত হচ্ছেই না, ট্যুরিজম ব্যবসা সরকারি-বেসরকারি এমনকি পর্যটকদের দ্বারাও পরিচালিত হচ্ছে। আর কঠিন একারণে যে, টেকসই ট্যুরিজম ধারণাটি অস্পষ্ট (অস্পষ্ট হওয়ার মূল কারণ টেকসই ট্যুরিজমে ট্যুরিজমকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয়)। টেকসই ট্যুরিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জেমি লিসে বলেন, 'টেকসই ট্যুরিজমের ধারণাটি হলো পর্যটক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা এবং পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলা'। (Lisse, 2018)। পরিবেশের ওপর প্রভাব না ফেলে পর্যটন শিল্পকে ত্বরান্বিত করাই টেকসই ট্যুরিজমের মূল ধারণা। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টারকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে। ট্যুরিজমের কোন ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করলে পরিবেশের ক্ষতি হবে না। বর্তমান ট্যুরিজম শিল্পের কোন বিষয়গুলো পরিবেশের জন্য হুমকি সে বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন হতে পারে। বাংলাদেশের সকল পর্যটন কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, রিপোর্টারের প্রতিবেদন এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. অভিবাসন রিপোর্টিং: অভিবাসনবিষয়ক রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টারকে উদ্বাস্তুদের (রিফিউজি) প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। অভিবাসনবিষয়ক রিপোর্টিং মূলত জনসাংবাদিকতার মুখপত্র। অভিবাসনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে স্টোরিটেলিং প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। অভিবাসন রিপোর্টিংয়ের অন্যতম হাতিয়ার হবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং, সম্প্রদায়গুলোর জন্য শিক্ষামূলক প্রতিবেদন, মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ, সামাজিক সংযোগ, আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামো সমর্থন করা। এর মধ্যদিয়ে প্রতিবেদক বা গণমাধ্যম মানবাধিকারকে সমর্থন করবে। অভিবাসনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের অন্যতম উৎস হতে পারে অভিবাসী সমর্থনকারী এজেন্সিগুলো।

ঘ. নৈতিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: সাংবাদিকতার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার মৌলিক নিয়মাবলি এই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে মূল বিষয় এটাই যে, এখানে সাংবাদিক অনেক বেশি নৈতিকতার দিকে মনোযোগী হবে। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক দুর্নীতি, জনগণের ফান্ডের অব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশগত বিপর্যয়, এছাড়াও আরো অনেক সামাজিক সমস্যা এই সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত হবে। নৈতিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, নৈতিকতা এবং নাগরিকবিষয়ক' সাংবাদিকতার বিকল্প রূপ। অনুসন্ধানী

> *এই কয়েক ধরনের প্রতিবেদন ছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় রেখে আরো কয়েক ধরনের প্রতিবেদন করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা, শিক্ষাবিষয়ক সাংবাদিকতা এবং জেন্ডার সাংবাদিকতা, এই তিন ধরনের সাংবাদিকতা টেকসই উন্নয়নের খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরতে পারে*

প্রতিবেদন লেখার সময় অবশ্যই রিপোর্টারকে জন আগ্রহ ও সামাজিক গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সংবাদের উৎস হিসেবে সাধারণ জনগণ এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অন্যান্য সকল উৎসকে গুরুত্ব দেয়া, তথ্যগুলো সংগঠিত করা, শব্দ ও বাক্যের যথার্থতা নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করা নৈতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ঙ. ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক নেটওয়ার্ক সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকতার পরিবর্তিত ধারা: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অবশ্যই ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং সাংবাদিকতার পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে জানতে হবে। এজন্য রিপোর্টারকে অবশ্যই নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ সাইটের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার নতুন ধারার সাথে খাপ খাওয়াতে হলে রিপোর্টারকে ক্রাউড সোর্স, নাগরিক সাংবাদিকতা, নয়া সাংবাদিকতার ধরন সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। 'উদ্যোক্তা সাংবাদিকতা' সম্পর্কেও রিপোর্টারকে সম্পূর্ণ অবগত থাকতে হবে। তথ্য উৎপাদন এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে। 'মোবাইল সাংবাদিকতা' টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ডিজিটাল যুগের সাংবাদিকতার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো নৈতিকতা। ডিজিটাল কনটেন্টের অপব্যবহার, গোপনীয়তা, কপিরাইট, নৈতিকতা সম্পর্কে রিপোর্টারকে সচেতন থাকতে হবে।

চ. অ্যাডভোকেসি রিপোর্টিং: মূলধারার সাংবাদিকতা অ্যাংলো-আমেরিকান সাংবাদিকতাকে অনুসরণ করে। যেখানকার মূল উদ্দেশ্য হলো 'বস্তুনিষ্ঠতা' এবং 'নিরপেক্ষতা'। অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা এই মূলধারার সাংবাদিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে গড়ে উঠেছে। সিভিক, অংশগ্রহণমূলক এবং রেসিপ্রক্যাল সাংবাদিকতাকে ভিত্তি করে অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা গড়ে ওঠে। ডিজিটাল প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফটো-জার্নালিজম, ভিডিও জার্নালিজম এবং কমিউনিটি সাংবাদিকতা অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা এবং সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে। সিলভিও ওয়েজবোর্ড অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতাকে দু'টি মডেলে বিভক্ত করেন। প্রথমটি, জার্নালিস্ট ফোকাসড মডেল এবং দ্বিতীয়টি, সিভিক মডেল। বঞ্চিতদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক যখন সংবাদ লেখেন তখন সেই মডেলকে জার্নালিস্ট ফোকাসড মডেল হিসেবে গণ্য করা হয়। সিভিক মডেলটি হলো গণমাধ্যমের সাথে এবং গণমাধ্যমের দ্বারা সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়িত হওয়াকে বোঝায়। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সময় রিপোর্টারকে অবশ্যই এই দু'টি মডেলের ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হবে।

ছ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক রিপোর্টিং: টেকসই উন্নয়নের ১৭তম লক্ষ্যমাত্রা হলো 'লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব'। এখানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয় বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও নিয়ম-কানুনের সাথে সংগতিবিধান এবং তাদের সিস্টেমের সাথে যথাযথভাবে মানিয়ে নেয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কার্যকর ও কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা করা। নর্থ-নর্থ, সাউথ-সাউথসহ ত্রিমুখী আঞ্চলিক সহায়তা বৃদ্ধি করা। (খান, ২০১৬)

এই লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনা করে সংবাদ প্রকাশ করতে হলে, রিপোর্টারকে সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন দেশের সমাজসেবক, সংস্থা, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ফেসবুক, ই-মেইল, স্কাইপি, টুইটার, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদি সাংবাদিককে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক রিপোর্টিংয়েও রিপোর্টারকে মাল্টিমিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমবিষয়ক রিপোর্টিং টুলগুলো ব্যবহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে দু'টি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। ২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠা টেকসই উন্নয়নবিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করা; ২. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা।

এই কয়েক ধরনের প্রতিবেদন ছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় রেখে আরো কয়েক ধরনের প্রতিবেদন করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা, শিক্ষাবিষয়ক সাংবাদিকতা এবং জেন্ডার সাংবাদিকতা, এই তিন ধরনের সাংবাদিকতা টেকসই উন্নয়নের খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যবিলোপ করতে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ২৪.৮ শতাংশ থেকে ৬.২ শতাংশ কমিয়ে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আবার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির হার ১০০% নিশ্চিত করা, ২০-২৪ বছর বয়সি নারী শিক্ষার্থী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর হারে সমতা আনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসডিজি'কে সামনে রেখে এই সকল সিদ্ধান্তের কতদূর অগ্রগতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিসহ নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে রিপোর্টার প্রতিবেদন করতে পারেন।

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করা।
- 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন' এর একাগ্র অংশ মুক্ত, স্বাধীন এবং বহুত্ববাদী গণমাধ্যম ব্যবস্থা। সমাজে সুশাসন নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমকে প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
- মধ্যস্থতাকারীদের সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়নে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর করা হচ্ছে। গণমাধ্যমকে অবশ্যই এই মধ্যস্থতাকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। সেই সাথে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতার মাধ্যমে সজাগ রাখতে হবে। মধ্যস্থতাকারী হতে পারে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী।
- আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ বৃদ্ধি করা।

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং সাত নীতিমালা

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং লেখার সময় রিপোর্টারকে সাতটি নীতিমালা মেনে চলতে হয় (Shanahan, Shubert, & Corcoran, 2013)।

ক. গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয় খুঁজে বের করা: সাধারণত যে কোনো টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে শত শত বিলিয়ন ডলারের সম্পৃক্ততা থাকে। সেক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক যে কোনো ধরনের রিপোর্টিং করার সময় রিপোর্টারকে অবশ্যই আর্থিক বিষয়টি খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করার ক্ষেত্রে অর্থ (টাকা) কোথা থেকে আসছে? অর্থগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করছে? অর্থ ব্যয় করছে কে? ইত্যাদি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে রিপোর্টারকে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, উন্নত দেশগুলো অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে তাদের দেয়া কথাগুলো রাখছে কিনা। এভাবে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক যেকোনো ধরনের রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থের বিষয়টি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। তবেই একটি ভালো সংবাদ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

খ. বৈশ্বিক বিষয়সমূহের স্থানীয়করণ: রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে, বিশেষত টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে 'বৈশ্বিক বিষয়সমূহের স্থানীয়করণের' বিষয়টি। প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ।

গ. রিপোর্টিংয়ের নয়া দৃষ্টিকোণ তৈরি: প্রত্যেকটি নতুন পলিসি, নতুন উদ্ভাবন, নতুন যে কোনো কিছু ঘটনা বা কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে থাকে। এই কার্যক্রমগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মধ্যে আন্তঃপ্রভাব তৈরি করে। এই আন্তঃপ্রভাব অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে রিপোর্টার প্রতিবেদনের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণের খোঁজ পেয়ে থাকে। দৃষ্টিকোণগুলো হতে পারে স্বাস্থ্য,

শিক্ষা, ব্যবসা, প্রযুক্তি, খাদ্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ট্যুরিজম, ধর্ম এবং রাজনীতি- প্রকৃতপক্ষে সমাজের সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. সংবাদ অনুসরণ করা: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্ট খুঁজতে রিপোর্টার অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপর নজর রাখবে। যেমন: রয়টার্স, গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি ইত্যাদি। এই ধরনের সংবাদ সংস্থাগুলো অনেক ভালো ভালো সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। তাই সেগুলোর ওপর প্রতিবেদককে কড়া নজর রাখতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ সাইটের প্রতিও রিপোর্টারকে ভালো নজরদারি দিতে হবে। বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটার। এখান থেকেই রিপোর্টার টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টের নির্দিষ্ট বিষয় খুঁজে পেতে পারেন।

ঙ. মেইলিং তালিকার সাথে যুক্ত থাকা: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টারকে আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নবিষয়ক জ্ঞানের সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে। আর এক্ষেত্রে বিশ্ব মেইলিং তালিকার সাথে যুক্ত থাকলে কাজটি খুবই সহজ হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (আইআইএসডি) বিনামূল্যে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক জ্ঞান বিতরণের জন্য ওয়েবসাইট খুলেছে। যেখানে টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত রিপোর্টাররা ই-মেইলে সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে যুক্ত থাকতে পারেন। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নবিষয়ক যে কোনো ঘটনার আপডেট তথ্য প্রতিবেদন ই-মেইলেই পেয়ে যাবেন। তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে এসডিজি আপডেট, জলবায়ু পরিবর্তন, বন, শক্তি, ভূমি ইত্যাদি। ই-মেইলে সংযুক্ত থাকার ওয়েবসাইটটি হলো: http://enb.iisd.org/email/।

চ. জার্নাল পড়া: জার্নালে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। জার্নালে প্রকাশিত এসকল গবেষণা প্রতিবেদন পড়লে রিপোর্টার নতুন নতুন টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে উৎসাহী হবে। এক্ষেত্রে রিপোর্টার গুগল স্কলারের সাহায্য নিতে পারেন। গুগল স্কলার নতুন নতুন গবেষণা প্রতিবেদনের সন্ধান দিতে পারে। সেখান থেকে প্রাপ্ত গবেষণা সরাসরি পিডিএফ ফাইল অথবা অন্য কোনো ফরম্যাট ডাউনলোড দিতে পারেন। ডাউনলোড দেয়া না গেলে রিপোর্টার লেখককে সাংবাদিক পরিচয়ে মেইল প্রদান করে গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। একই সাথে রিপোর্টার গবেষককে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন। গুগল স্কলার ছাড়াও রিপোর্টার ইন্টারনেট থেকে সাধারণ সার্চের মাধ্যমে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসন্ধান করতে পারেন। গুগল স্কলারের ওয়েবের ঠিকানা হলো: http://scholar.google.com।

ছ. সংযুক্ত থাকা: একজন সাংবাদিকের অসংখ্য সংবাদ-উৎস থাকে না। কিন্তু টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্ট করতে গেলে অবশ্যই রিপোর্টারকে বিশাল সংবাদ-উৎস গড়ে তুলতে হবে। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্ট করার সময় অবশ্যই রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে। এজন্য রিপোর্টারকে বিশাল যোগাযোগের তালিকা তৈরি করতে হবে। দেশের মধ্যে এমনকি দেশের বাইরের যোগাযোগ ঠিকানা ও ফোন নম্বর এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে: পলিসি মেকার, আন্তঃসরকারি সংস্থা, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, সুশীলসমাজ এবং গবেষণা কেন্দ্র। তবে ভালো সংবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেও হতে পারে যেমন- কৃষক, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

ভালো সংবাদ প্রতিবেদন লেখার উপায়

- সংবাদটির পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাকে সর্বপ্রথম বিবেচনায় রাখতে হবে। রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, তার পাঠক কিছুই জানে না।
- জটিল শব্দ ও বাক্য পরিহার করতে হবে। সহজ-সরল ভাষায় প্রতিবেদন লিখতে হবে।
- প্রতিবেদককে এমনভাবে সংবাদ লিখতে হবে যেন পাঠকের সামনে পুরো প্রতিবেদন ছবির মতো ভেসে ওঠে। পরিবেশবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে জটিল বিষয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। সেখানে রিপোর্টার ছবি, গ্রাফিক্স, ম্যাপ, সাইডবারের সাহায্য নিতে পারেন।
- সংবাদে একাধিক পক্ষের মতামত তুলে ধরতে হবে।
- সংবাদ উৎসের তথ্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় উৎস দ্বারা যাচাই করতে হবে।
- সংবাদে শুধু বক্তব্য পাঠককে একঘেয়েমিতে ফেলতে পারে। যে কারণে বক্তব্যের পাশাপাশি রিপোর্টারকে প্রতিক্রিয়াও তুলে ধরতে হবে।
- টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদনের অন্যতম উপাদান মানবিক আবেদন। টেকসই উন্নয়নবিষয়ক সাদামাটা সংবাদের মানবিক আবেদনমূলক করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ মানবিক আবেদন পাঠকের মানসিক অবস্থায় আঘাত করতে পারে।
- প্রাপ্ত প্রেসরিলিজকে বিশ্বাস না করে রিপোর্টারের উচিত বিষয়টিকে যাচাই করে নেয়া।
- টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের বিষয় শুধু অনিয়ম বা দুর্নীতি নয় এখানে সফলতার কাহিনীও ছাপাতে হবে। সফল কাহিনী অন্যদেরকে সফল হতে উৎসাহিত করবে।
- টেকসই উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্ট করার সময় রিপোর্টারকে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, পরিবেশসহ সমাজের নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু কেউ-ই এতগুলো বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। তাই ভালো সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে হলে দল গঠন করতে হবে। একজন সাংবাদিক অন্য সাংবাদিকের সাথে দল গঠন করবে। এতে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময় ঘটবে এবং একটি ভালো প্রতিবেদন লেখা সম্ভব হবে।
- রিপোর্টারকে ভালো প্রতিবেদন লিখতে হলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সুশীলসমাজসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র

খান, মো. লিয়াকত আলী খান (প্রধান সম্পাদক) (২০১৬), *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট*, ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

ভট্টাচার্য, হরিপদ, হোসেন, ফেরদৌস (১৯৯৯), ধারণযোগ্য উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট ও মর্মার্থ, *রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল*, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৯৭।

লিপন, সহিদ উল্যাহ (২০০০), উন্নয়ন সাংবাদিকতা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *নিরীক্ষা*, সংখ্যা-১০১, পৃ. ২৭।

Adams, W. (2006). *The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century.* UK: IUCN.

Banda, F. (. (2015). *Teaching Journalism for Sustainable Development.* Paris: UNESCO.

Brundtland, H. B. (1987). *Our Common Future.* Oxford: Oxford University Press, for the World Commission on Environment and Development.

Lélé, S. (1991). Sustainable development: a critical review. *World Development*, 607-621.

Lisse, J. (2018). *What Is the Meaning of Sustainable Tourism?* Retrieved January 02, 2018, from USA Today: http://traveltips.usatoday.com/meaning-sustainable-tourism-2297.html

McCormick, J. (1992). *The Global Environmental Movement: reclaiming Paradise.* London: Belhaven.

Passet, R. (1979). *L'Économique et le vivant (in French).* Paris: Payot.

Shanahan, M., Shubert, W., & Corcoran, T. (2013). *Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists.* France: UNESCO.

Turner, R. (1988). A Survey of the Sustainable Economic Development Debate. *Journal of Agricultural Economics*, Canada.

WCED, (. (1987). *A Guide to Our Common Future.* Switzerland: WCED.

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কোন পথে

কুদরত-ই-মওলা

সাংবাদিকতা বলতে বেশির ভাগ লোকই মনে করেন প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপন। তবে প্রচলিত সাংবাদিকতার বাইরে দেশের উন্নয়নকে মুখ্য উপজীব্য বিবেচনা করে প্রতিবেদনে আরেকটু গভীরে গিয়ে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরাই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার তাত্ত্বিকরা এমনটিই মনে করেন।

ইতিহাস ও পূর্বকথা: উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের সাংবাদিকতার বিশেষভাবে চর্চা দেখা যায়। অন্য কথায় বলা যায়, এসব দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদ ও যোগাযোগ আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার অসন্তোষ থেকে এর

তবে প্রচলিত সাংবাদিকতার বাইরে দেশের উন্নয়নকে মুখ্য উপজীব্য বিবেচনা করে প্রতিবেদনে আরেকটু গভীরে গিয়ে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরাই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা

উৎপত্তি। এ ধরনের সাংবাদিকতার ধারণাটি আসে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬০ সালে প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া থেকে। সেখানে দু'জন ফিলিপিনের সাংবাদিক এ বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা তুলে ধরেন। তাদের মতে, মূলধারার সাংবাদিকতায় উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণে সংবাদমাধ্যম আগ্রহী নয়। বরং এ জাতীয় খবরগুলো ভাসাভাসাভাবে পরিবেশন করে থাকে। তবে মজার ব্যাপার হলো, সিঙ্গাপুরের প্রতিবেশী মালয়েশিয়া উন্নয়ন সাংবাদিকতার চর্চা নিজেদের মতো করে শুরু করে ১৯৫৭ সালে, সেদেশে উপনিবেশবাদের বিদায়লগ্ন থেকে। তদের কাছে এ ধরনের সাংবাদিকতা মূলধারার আসন নিয়ে আছে। এ কাজটির প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকে সেদেশের প্রধান জাতীয় গণমাধ্যম বারনামালা।

বৈশিষ্ট্য

উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিবেচ্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা– সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা ও সরকারের নেয়া পদক্ষেপের ভালো-মন্দ দিকগুলো ব্যাখ্যা করে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা।
২. শিক্ষা– কোনো নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প কীভাবে সরকারের কাজে আসবে।

৩. জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, মতৈক্য গড়ে তুলে তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। এ ধরনের সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা থেকে জনগণের প্রত্যাশা অনেক– বিশেষভাবে কর্তব্যপরায়ণতা, সম্মান, ন্যায় ও সুন্দর জীবন, যা একজন সাংবাদিকের কাছে দেশবাসীর কাম্য।

সীমাবদ্ধতা

১. জনগণ কী চায়, সে অনুযায়ী তথ্য আহরণ ও পরিবেশন করতে হয়– এভাবে তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে মূল কথা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
২. অজ্ঞতা– পরিবেশনার ধরন জানা না থাকা এবং কীভাবে পরিবেশন করলে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে।
৩. মালিকের আগ্রহ-অনাগ্রহ– সংবাদমাধ্যমের অর্থলগ্নিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রচারে তেমন আগ্রহী না থাকলে বা লাভজনক মনে না করলে প্রচারের গণ্ডি ছোট হয়ে আসে।
৪. সময়মতো পরিবেশনা না করতে পারলে আবেদন তেমন থাকে না, ফলে এর প্রভাব ঠিকমতো বোঝা যায় না।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার জন্য বাংলাদেশ সমাজ কতটা প্রস্তুত

উন্নয়ন সাংবাদিকতার স্বরূপ কেমন হবে, তার চুলচেরা হিসাব-নিকাশ কষতে গেলে দেশটির প্রধান সমস্যাগুলো কী, উন্নয়নের প্রধান বাধাগুলো কী, তা স্পষ্ট জানা দরকার। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের বড় মাপের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে: বেকারত্ব, দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য, বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন, সন্ত্রাস এবং ভূমিকম্প। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাদে এ সমস্যাগুলোর বেশির ভাগই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোতে এবং কোনো কোনোটি তাদের কারণে সৃষ্ট সমস্যা। আরো কিছু সমস্যা, যাকে বলা যায় উটকো সমস্যা, যা সামাজিক অগ্রগতির লাগামকে পিছে টেনে রাখে। যেমন– এসিড সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রবণতা, মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও নেশাজাতীয় ওষুধ বা ইনজেকশন আসক্তি। এসব সমস্যার কোনো কোনোটা উন্নত বিশ্বেও রয়েছে, যার সমাধান সহজেই সম্ভব যদি বিষয়টির প্রতি আমাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন আনা যায়।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সরকার বা সরকারগুলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা সম্পর্কে কতটা ধারণা রাখে এবং প্রকৃত উন্নয়ন সাংবাদিকতা কতটুকু সহ্য করতে পারে। কারণ শুধু উন্নয়ন প্রকল্পের ভালো দিকগুলো তুলে ধরলেই পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন সাংবাদিকতা হয় না, যা হয় সরকার বা এনজিও'র গুণগান প্রচার। বলতে বাধা নেই, বর্তমান বাংলাদেশ সরকার গণমাধ্যমে নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। কাজেই উন্নয়ন সাংবাদিকতার কাজটি এদেশে খুব দুরূহ, তা বলা ঠিক হবে না।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা কি আছে? স্বাধীনতার পর দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক বেশক'টি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা গড়ে উঠল এবং তাদের নিজস্ব প্রকাশনাসহ দৈনিক পত্রিকা, রেডিও-টিভিতে প্রচার শুরু করে। তারও আগে থেকে সরকার সিনেমা হল, রেডিও-টিভিতে মূলত সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে উন্নয়ন সংবাদ প্রচার শুরু করে, যা পরে উন্নয়ন সাংবাদিকতায় রূপ নেয়। সাংবাদিকতার বিষয় হলো দেশের নানা সমস্যা ও তার সমাধানে সরকার বা এনজিও'র উদ্যোগ এবং সাফল্যের চিত্র।

এ ব্যাপারে বিশদ আলোকপাত করার আগে মোটা দাগে বোঝা দরকার, উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলতে আমরা কী বুঝি এবং এর ব্যাপ্তি কতটা বা আদৌ এর কোনো সীমারেখা টানা উচিত কীনা। যেহেতু, জীবনমান উন্নয়নে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনই হলো উন্নয়ন সাংবাদিকতা, তাই আমাদের চারদিকের কোনো বিষয়ই এর আওতার বাইরে থাকার সুযোগ নেই।

বেসরকারি গণমাধ্যমের চিত্র

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রসার হয়েছে, যদিও দৈনিক পত্রিকার চল কমের দিকে। বিশেষ করে অনলাইন পত্রিকা, বেসরকারি টিভি ও রেডিও চালু হয়েছে, উভয়েরই সংখ্যা নিয়মিত বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ঠিক কতটি অনলাইন পত্রিকা আছে বলা মুশকিল, তবে জনপ্রিয়তা বা অধিক ব্যবহারের তালিকা দীর্ঘ নয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউএনবি, বিডিনিউজ, বাংলানিউজ, রাইজিংবিডি। আর সেই সঙ্গে ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন, প্রথম আলোর আনলাইন ভার্সন চোখে পড়ার মতো। অবশ্য এসব মাধ্যমে উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে সংবাদ প্রচার তেমন নেই, যদিও দৈনিক পত্রিকায় এর সুযোগ বেশি থাকায় সেখানে তার দেখা মেলে। তবে বেসরকারি সব টিভি চ্যানেলই কমবেশি কাজ করে। চ্যানেল আইয়ের কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান এবং ডিবিসি'র কৃষি ও নারীবিষয়ক দৈনিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

66

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রসার হয়েছে, যদিও দৈনিক পত্রিকার চল কমের দিকে। বিশেষ করে অনলাইন পত্রিকা, বেসরকারি টিভি ও রেডিও চালু হয়েছে, উভয়েরই সংখ্যা নিয়মিত বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ঠিক কতটি অনলাইন পত্রিকা আছে বলা মুশকিল, তবে জনপ্রিয়তা বা অধিক ব্যবহারের তালিকা দীর্ঘ নয়

99

কমিউনিটি রেডিও এবং উন্নয়ন সাংবাদিকতা

এ ব্যাপারে সরকার বসে নেই। কমিউনিটি রেডিও স্থাপন ও সম্প্রচার নীতিমালা-২০০৮ এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন করেছে সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের মধ্যেই ১৪টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি মিলেছে এবং পরবর্তী সময়ে আরো ৩টি কেন্দ্র অনুমতি পায়। কেন্দ্রগুলো হলো: রেডিও পদ্মা, রেডিও নলতা, লোকবেতার, রেডিও পল্লীকণ্ঠ, রেডিও সাগরগিরি, রেডিও মহানন্দা, রেডিও মুক্তি, রেডিও চিলমারি, রেডিও ঝিনুক, রেডিও নাফ, রেডিও সুন্দরবন, রেডিও বিক্রমপুর, রেডিও মেঘনা, রেডিও সাগরদ্বীপ ও রেডিও সারাবেলা। এসব বেতার কেন্দ্র

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সংখ্যা আরো বাড়ছে এবং বাড়বে, যদিও এদের বেশির ভাগই বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত। তাদের একটি সংস্থা রয়েছে– বালাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)। যাবতীয় কার্যক্রম সার্বিক দেখাশোনা করে এ সংগঠনটি। সবক'টি কেন্দ্র মিলে প্রতিদিন গড়ে ১০ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে, যার একটা বড় অংশজুড়ে থাকে তৃণমূলের লোকজনকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা।

বিএনএনআরসি'র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এসব কেন্দ্রের সারাদেশে ৫৫ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রোতা রয়েছে।

সরকারি গণমাধ্যমের চিত্র

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকার পরিচালিত কোনো জাতীয় দৈনিক নেই। আছে বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। সরকার পরিচালিত সংবাদ সংস্থা বাসসে নিয়মিত রোজকার খবরগুলো থাকে।

বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনকে বাদ দিলে চলবে কী করে! সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই বলি বা স্থূল অর্থে উন্নয়ন সাংবাদিকতাই এদেশে পুরোধা হলো এ দুটি মাধ্যম।

বিটিভি

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা টেরিস্ট্রিয়াল এবং বিটিভি ওর্য়াল্ড ২৪ ঘণ্টা অধিবেশন সম্প্রচার করছে।

বিটিভি এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার আংশিক এলাকায় দেখা যায়। বিটিভি সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন স্বার্থ বিবেচনায় রেখেই সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে চলেছে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, উন্নয়ন চাহিদা ও জীবনের কর্মধারা নিয়ে গণমুখী অনুষ্ঠান, নারী ও শিশু উন্নয়ন যোগাযোগ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি-জনসংখ্যা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।

বালাদেশ বেতার

রেডিও অনুষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত সরাসরি উন্নয়নমূলক বিষয়গুলো হলো :

সপ্তাহে দুদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ টেকসই উন্নয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে 'ধরিত্রি' (সাপ্তাহিক) আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও কথিকানির্ভর অনুষ্ঠান 'উন্নয়নের চাবিকাঠি' (সাপ্তাহিক), নারীর উন্নয়নমূলক 'নারীর কথা' (সাপ্তাহিক) ও কৃষিবিষয়ক দৈনিক অনুষ্ঠান 'দেশ আমার মাটি আমার'।

এজাতীয় অনুষ্ঠানগুলো আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র– চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবান ও কুমিল্লা স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের কাজে লাগিয়ে করে।

মোটা দাগে বললে উন্নয়ন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলো এবং লোকজ ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো বাদে (বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের) অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে, যা সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত নয়, কিন্তু মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। যেমন– জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতিবিষয়ক দৈনিক অনুষ্ঠান 'দর্পণ',

জলবায়ু-পরিবেশ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিষয়ক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'প্রকৃতি ও বিজ্ঞান', জনসংখ্যা কার্যক্রম প্রযোজিত দৈনিক অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল', স্বাস্থ্যবিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'রোগ জিজ্ঞাসা', মহিলাদের জন্য দৈনিক অনুষ্ঠান বহ্নিশিখা ও অঙ্গনা, সৈনিক ভাইদের জন্য দৈনিক জাতীয় অনুষ্ঠান 'দুর্বার', বিষয়ভিত্তিক ধর্মীয় আলোচনা 'জীবনের আলো', প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠান (সাপ্তাহিক) 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান (সাপ্তাহিক) 'যুবতরঙ্গ' ও দৈনিক অনুষ্ঠান 'আজকের কবিতা'।

এ প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো এই যে, বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম নামে একটি বিভাগ রয়েছে, যা বাংলা, ইংরেজী, নেপালি, আরবি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় সংবাদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সমাজ গঠনে অত্যাবশ্যক সম্ভাব্য সব বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশ ও এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ করে দিচ্ছে দেশের বাইরে প্রবাসী বাঙালি এবং অন্য ভাষার লোকজনের জন। এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে বোঝানো মুশকিল যে, এ মাধ্যমটি কীভাবে জাতি ও সমাজ গঠনে উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যুগের পর যুগ।

উপসংহার

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতা চর্চার সময়কাল দীর্ঘ হলেও এখনো দৈনিক পত্রিকাগুলো বাদে অনলাইন পোর্টাল ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর আরো করণীয় রয়েছে। সেজন্য প্রয়োজন দেশে সুশাসন, জবাবদিহিতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়া। তবেই এ সাংবাদিকতার চর্চা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে এবং দেশ ও দেশের জন্য সত্যিকারের মঙ্গল বয়ে আনবে। মনে রাখতে হবে, সরকার শুধু এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমনটি প্রতিফলিত হয় বিটিভি, বিশেষ করে, বাংলাদেশ বেতারের নিরলস দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। সেই তাল ও ছন্দের ছাপ বেসরকারি গণমাধ্যমে থাকতে হবে। তাহলে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

লেখক: বার্তা সম্পাদক, ডিবিসি

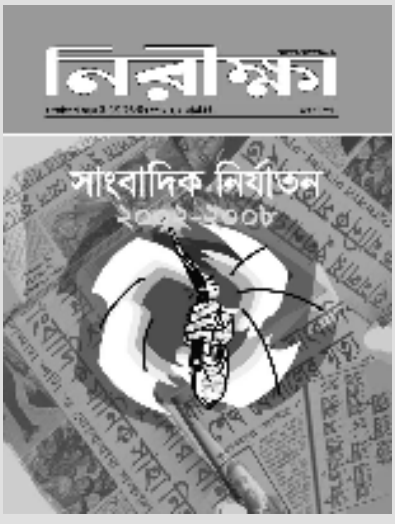

গণমাধ্যম বিষয়ক আপনার লেখাটি নিরীক্ষার পাতায় মুদ্রণ করতে চাই। এর জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখাটি নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

নারীবিষয়ক গণমাধ্যম

ড. শিল্পী ভদ্র

'একসময় সাংবাদিকতায় নারীরাই আধিপত্য বিস্তার করবে'[১]– তাসমিমা হোসেন, যিনি দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত নারীবিষয়ক ম্যাগাজিন পাক্ষিক 'অনন্যা' অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে সম্পাদনা ও প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

নারীবিষয়ক গণমাধ্যম নারীদের রঙিন কাগজের মোড়কে আবদ্ধ রেখে শুধু সংবাদ পরিবেশনই করে না; সে সঙ্গে নারীর অধিকার, মূল্যায়ন, প্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়। নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারীজাগরণের লক্ষ্যে সাহসিকতার সঙ্গে লেখনী ধরেছিলেন। তাঁর লেখা এখনো

নারীবিষয়ক গণমাধ্যম নারীদের রঙিন কাগজের মোড়কে আবদ্ধ রেখে শুধু সংবাদ পরিবেশনই করে না; সে সঙ্গে নারীর ... নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারীজাগরণের লক্ষ্যে সাহসিকতার সঙ্গে লেখনী ধরেছিলেন

সমাজকে আলোড়িত করে। বেগম রোকেয়ার পর সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম আর তসলিমা নাসরিনকে পেয়েছি। নারীরা আজ যতটা সোচ্চার হতে পেরেছে, তার বীজ বুনেছিলেন বেগম রোকেয়াই। তিনি নারী-মুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে নারী-শিক্ষার কথাই বলেছেন।

'৯০ দশকের পর নারীদের চিন্তা-চেতনায় ধাক্কা দেন নারীবাদী লেখকরা। বেগম রোকেয়া নারীদের জন্য দাবি করে গেছেন। সেসব দাবি পূরণের লক্ষ্যে তাঁর উত্তরসূরিরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সুপ্রীতি ধর মনে করেন– 'তাঁর সময়ে তিনি একা ছিলেন। এখন অনেক বেশি নারী কথা বলছে, পার্থক্য এখানেই।'[২] শুধু তাই নয়, নারীজাগরণ, নতুন লেখক সৃষ্টি, নারী অধিকার, নারী নিরাপত্তা, নারীর চেতনা সৃষ্টি, সাহিত্য ও সৃজনশীলতা এবং ইন্টারনেটের বৃহৎ পরিসরে অংশগ্রহণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নারীবিষয়ক বেশ কটি গণমাধ্যম অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে, যার সম্পাদক এবং প্রকাশকও নারীই।

এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম আসে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'র। এটি ভারত উপমহাদেশের ১ম নারীবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই থেকে।[৩] পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার অগ্রদূত এবং সাহিত্যিক নূরজাহান বেগমের পিতা মোহাম্মদ

নাসিরউদ্দীন (যিনি 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন)। 'বেগম' পত্রিকার ১ম সম্পাদক সুফিয়া কামাল। তিনি প্রথম চার মাস এর সম্পাদনা করেন, তখন নূরজাহান বেগম পড়তেন বিএ শ্রেণিতে এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন 'বেগম' পত্রিকার। তিনি তাঁর সাখওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এবং লেডি বেবোর্ন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এই পত্রিকার জন্য কাজ করতেন এবং ছয় দশকের বেশি সময় এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'বেগম' পত্রিকার বিষয় ছিল– নারীজাগরণ, কুসংস্কার বিলোপ, গ্রামগঞ্জের নির্যাতিত মহিলাদের চিত্র, পরিবার পরিকল্পনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের লেখা চিঠি ও মনীষীদের বাণী।[৪]

১৯৫০ সালে রোকনুজ্জামান খানকে (দাদাভাই) বিয়ে করে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। ঢাকায় এসে 'বেগম' পত্রিকায় মেয়েদের অংশগ্রহণে উৎসাহী করতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লেখা, আঁকা ছবি সংগ্রহ করা হতো। এর বিশেষত্ব ছিল– যারা লেখা পাঠাতেন এতে তাদের ছবি ছাপা হতো।

১৯৫৪ সালে মার্কিন মহিলা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মিসেস আইদা আলসেথ ঢাকায় 'বেগম' পত্রিকার অফিস পরিদর্শন করেন। আর এই ৫৪ সালের ডিসেম্বরে 'বেগম ক্লাব' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, সেক্রেটারি নূরজাহান বেগম এবং অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল।

নূরজাহান বেগম আজীবন মানুষের সেবায় কাজ করে গেছেন। নারীর মুক্তি, নারীর উত্তরণ, নতুন লেখক সৃষ্টি, সাহিত্য ও সৃজনশীলতায় নারীকে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। তিনি বুঝেছিলেন, নারীদের এগিয়ে নিতে অবশ্যই সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

> *অবশ্য আমাদের দেশে টিনএজার নারীরা অনলাইন জগতে এগিয়ে আছে ফেসবুকের মাধ্যমে। এই মাধ্যমে তারা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতার উন্নয়ন না ঘটিয়ে নানা রকম নোংরামি, অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। অনলাইনের অপব্যবহার না করে একে জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সৃজনশীল কাজে লাগাতে হবে। এতে বাংলাদেশের নারীদের বিষয়ে নানা খবর ও তথ্য নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে আর যারা অনলাইনে অনভ্যস্ত তাদের জন্য রয়েছে 'ত্রৈমাসিক মহীয়সী ম্যাগাজিন'র ব্যবস্থা*

নারীদের সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল 'বেগম' পত্রিকার উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় নারীকে আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। তাহলে সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত ঘটবে। যোগ্যতার সুবিচার করতে হবে তাদের।'

নূরজাহান বেগম নারীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি দলাদলি থাকে তাহলে দাবি আদায় করা সহজ হবে না। তোমাদের কাজের উন্নতির জন্য একজোট হয়ে আবেদন কর– এটাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ। তোমরা পিছিয়ে থেকো না, অযথা সময় নষ্ট করো না। তোমাদের জন্য আমার অনেক দোয়া।'[৫]

'বেগম'পত্রিকার পর নারীদের বিষয়ে দ্বিতীয় পত্রিকার নাম আসে পাক্ষিক 'অনন্যা'র। এটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় তাসমিমা হোসেনের সম্পাদনায়। তিনি ২০১৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অনন্যা বের করেছিলাম আজ থেকে ২৮ বছর আগে। এখন ওটা আমার একটা পরিচয়ের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।'[৬] এছাড়া তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার' এবং 'অনন্যা শীর্ষদশ' নামে দুটি পুরস্কার দিয়ে গুণী আর শীর্ষ নারীদের সম্মানিত করে চলেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। ১৯৯৩ সাল থেকে অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। গত ২৩ বছরে ২৩০ জন সংগ্রামী নারী এই সম্মাননা পেয়েছেন।[৭] তাসমিমা হোসেন নারীদের নিয়ে ভাবেন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চাওয়ার ভাবনা থেকেই 'অনন্যা'র জন্ম। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা হলেও বিয়ে হয় পত্রিকা মালিক, মানিক মিয়ার পুত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে। 'অনন্যা' প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর ভেতর ৩টি বিষয় কাজ করেছে– প্রথমত, পত্রিকা মালিক পরিবারে বিয়ে হওয়া। দ্বিতীয়ত, পিতার কাছে শেখা প্রশাসনিক দক্ষতা– যা তার ভাষায় 'বাবার কাছ থেকে ৩টা জিনিস শিখেছি– ১. লিখে রাখা, ২. মনে রাখা, ৩. স্টেপে স্টেপে কাজ করা।' তৃতীয়ত, মেয়ে হওয়ার যন্ত্রণার বাস্তবিক তিক্ত অভিজ্ঞতা (তাঁরা ৮ বোন এবং তিনিও ৪ কন্যার জননী)। তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে পত্রিকা-প্রকাশনার কাজে বেশি বিব্রত হয়েছেন। তাকে শুনতে হয়েছে– 'ও মেয়ে মানুষ, ও কী বোঝে, কী জানে?' নারী বলেই তাকে ঠকানো সহজ এবং তিনি ঠকেছেন, তবে ঠকেও কাজটা শিখে গিয়েছেন। মানুষ জার্নালিজম পড়ে, ট্রেনিং নিয়ে যা শেখে তিনি কাজ করতে করতে অর্থাৎ বাস্তবসম্মত ট্রেনিং করে তা শিখেছেন। তিনি নিজে প্রেসে গিয়েছেন, কাগজের দাম, ফর্মা পেস্টিং, প্লেটের দাম, কোন কাজে কতটা প্লেট লাগে– সবই হাতে কলমে শিখেছেন। কাজটা তিনি অনেক ঠকে, অনেক ধাক্কা খেয়ে, নারী-পুরুষ উভয়ের সমালোচনার শিকার হয়েও শিখেছেন এবং সব বিরূপ পরিবেশকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে গিয়েছেন। এরপর সফল হয়েছেন। ঘরে-বাইরে বারবার সমালোচনার শিকার হয়েছেন। যে নারীদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য কাজে নেমেছেন তারাই বলেছেন– 'আপনি অনন্যাকে নিয়ে এটা কী করছেন?' অনেকে তাকে 'নারীবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। এমনও শুনেছেন– 'মঞ্জুভাই বউ কন্ট্রোল করতে পারছেন না, হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।' নারীরাই নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। তিনি দেখেছেন, পুরুষতন্ত্র অনেক নারীর মধ্যে তীব্রভাবে বিদ্যমান। তার মতে, 'আমাদের সচেতন হতে হবে। কিসে আমাদের আসলেই সফলতা, সেটা বুঝতে হবে।'

তিনি 'অনন্যা'র কাজ করাতেন মূলত পার্টটাইমারদের দিয়ে। ৫টায় অফিস ছুটির পর ৫টা-৮টা পর্যন্ত। মোহাম্মদপুরের ১ ঘরের অফিসে ৫টা-৮টা পর্যন্ত কাজ করতে গিয়ে 'তোমার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো কেন"[৮] প্রশ্নের মাঝে-মধ্যেই সম্মুখীন হয়েছেন।

তাঁর মতে, 'নারীদের লড়াই তো চিরন্তন বিশেষ করে প্রান্তিক নারীদের।.... নিজের যতটুকু করার ক্ষমতা আছে তা করার জন্য নারীদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নিজেই নিজেকে তুলে ধরতে হবে। কেউ তাকে করে দেবে না'।[৯]

তিনি এদেশের সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটি ডরমেটরি (Dormitory) করার কথা ভাবছেন, যেখানে তারা ডিগনিটির সাথে থাকবেন। সেখানে সংস্কৃতি থাকবে, তাদের লেখা প্রকাশনার ব্যবস্থা থাকবে। 'অনন্যা' এজ এ ম্যাগাজিন সেখানে চলবে।

তাসমিমা হোসেন রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার দেশ ছেড়েছেন, কিন্তু একদিনের জন্যও 'অনন্যা' পত্রিকা বন্ধ হতে দেননি– এটা তার কাছে একটা বড় ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে সেই ২৯ বছর আগে শুরু করা 'অনন্যা' পত্রিকা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ পরিক্রমায়।

'অনন্যা'র পর বলা যায়, 'নারী সাংবাদিক' বুলেটিন এর নাম। এটি 'নারী সাংবাদিক কেন্দ্র'র ষাণ্মাসিক বুলেটিন। এই সংগঠনটির সভাপতি– নাসিমুন আরা হক মিনু, সাধারণ সম্পাদক– পারভিন সুলতানা ঝুমা, কোষাধ্যক্ষ– আখতার জাহান এবং সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। 'নারী সাংবাদিক'

বুলেটিনের যুগ্ম সচিব হচ্ছেন অদিতি রহমান। এ সংগঠন নারী সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে। কোনো নারী চাকরিচ্যুত হলে এ সংগঠন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীর কঠোর শাস্তির দাবিতে আলোচনাসভা, প্রতিবাদী মানববন্ধন করা, দেশে অব্যাহত শিশু ও নারী ধর্ষণ-নির্যাতনের বিচার ও বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন, নারীদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ রাখা প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে কাজ করে 'নারী সাংবাদিক কেন্দ্র'।

২০১৬ সালের ১ নভেম্বর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'গত ৬ মাসে ৩৫১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে'।[১০] সরকারের কাছে এ সংগঠন নির্যাতনকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানায়। তাদের মতে, 'অপরাধ করার পর বিচার না হওয়ায় অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

'২০১৬ সালের ২০ নভেম্বরে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর বহাল রাখার দাবি জানায় সংগঠনটি'।[১১]

যেখানেই নারীদের প্রতি অন্যায়-অবিচার চলে, সেখানেই বন্ধুর মতো তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি। বিভিন্নভাবে নির্যাতিত নারীবিষয়ক লেখা এবং সংগঠনটির আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিবাদী সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল, সেমিনারে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডবিষয়ক বিজ্ঞপ্তিগুলো 'নারী সাংবাদিক' বুলেটিনে ছাপা হয়। এটি ২০০৯ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে দুটো অনলাইন পোর্টাল ২০১৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। একটি হচ্ছে সুপ্রীতি ধরের 'উইমেন চ্যাপ্টার', অন্যটি শারমিন আকতারের 'মহীয়সী ডটকম'।

'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'– জাতিসংঘের এই স্লোগানই সুপ্রীতি ধরের 'উইমেন চ্যাপ্টার'র প্রেরণা। নারীরা কীভাবে বিভিন্ন ইস্যু দেখছে, তাকেই তুলে আনতে চায় এই পোর্টাল।

'উইমেন চ্যাপ্টার' প্রতিদিনের নিউজ পোর্টাল নয়। নারীর অধিকার, নারীর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যে আন্দোলন, সেগুলো লেখার মাধ্যমে, সংবাদের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য এর সৃষ্টি। সাংবাদিক অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে নারীর জন্য একটা কিছু করার ভাবনা থেকে ২০১৩ সালের জুনে শুরু হয় এই অনলাইন পোর্টালের। তাঁর মতে, অবস্থার পরিবর্তন আনতে চাইলে, অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের কণ্ঠ তুলতে হবে। তাঁর ধারণা, এদেশের নারী আন্দোলনের বড় বাধা। তাছাড়া সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীদের প্রতিবাদবিমুখতা এবং নিজেদের অবস্থান সুরক্ষার চেষ্টা সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়া এর বড় কারণ বলে তিনি মনে করেন।

'পরিবর্তনে নারী, সিদ্ধান্তে সমান অংশীদার'– এই স্লোগান নিয়ে কাজ করছে 'উইমেন চ্যাপ্টার'। নারী আন্দোলন আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। তাঁর মতে, '১৯৭৬ সালের পর থেকে নারী আন্দোলনেরও এনজিওকরণ হয়েছে।' বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারী অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে লেখার খুব বেশি সুযোগ নেই। 'উইমেন চ্যাপ্টার' ইন্টারনেটের এই যুগে সেই সংকীর্ণতা ভেঙে নারীদের লেখার জায়গা করে দিতে চায়। কারণ লেখালেখিতে সামাজিক পরিবর্তন তো বটেই নিজেরও একটা অবস্থান তৈরি করা যায়। তাই তিনি বলেন, 'যারা লেখালেখি করছেন, তাদের পেছনে আরো ১০ জন করে আছেন, যারা তাদের কথা শোনেন। ১০টা না হোক, দুটি মানুষকেও যদি এই লেখনীর মাধ্যমে সচেতন করা যায়, তাহলেও তো সমাজে অনেক বেশি প্রভাব রাখা সম্ভব।'[১২]

যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ বাড়েনি, তারপরও নারীদের কণ্ঠ ইদানীং শোনা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে নারীরা আগের তুলনায় বেশি দৃশ্যমান।

অনৈতিক ব্যবহার বা সহিংসতার শিকার নারীদের বিশেষ করে নারী সাংবাদিকদের সহায়তায় একটি সাপোর্ট সেন্টার চালু করার পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোচ্ছেন।

যেসব নারী গণমাধ্যমের কাজ থেকে ছিটকে পড়েছেন, প্রতিনিয়ত নানা সমস্যায় বাধ্য হয়ে কাজ ছাড়ছেন, তাদের মানসিক শক্তি জোগাতে প্রাথমিক পরামর্শদাতা এবং বেআইনিভাবে যারা চাকরি হারাচ্ছেন, তাদের আইনিসহায়ক হিসেবে কাজ করতে চান সুপ্রীতি ধর।

তিনি নারী হয়রানি বন্ধে নারীদের পাশে থাকতে চান 'উইমেন চ্যাপ্টার'র মাধ্যমে। সেটা পরামর্শ, লেখালেখি, আইনি সহায়তা, যেভাবেই হোক। তার ভাষায়–

'আজ যদি একটি মেয়ে হয়রানির শিকার হয়, যেটা সমাজকে নাড়া দিয়ে যায়, আমরা অর্থাৎ 'উইমেন চ্যাপ্টার' সেই মেয়েটির পাশে দাঁড়াতে পারি-সেটা সংবাদ আকারে হোক, আর লেখালেখির মাধ্যমেই হোক। ...আমরা হয়তো সমাজে একটি ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে পারি। এটা খুব জরুরি।'[১৩]

বাংলাদেশে 'মহীয়সী ডটকম' সম্পূর্ণ নারীবিষয়ক প্রথম অনলাইন নিউজ পোর্টাল। পত্রিকাটি ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রকাশক এবং সম্পাদক শারমিন আকতার একজন খ্যাতনামা, সৃজনশীল সাহিত্যিক এবং অনুবাদক। বাংলাদেশের সৃজনশীল ও জ্ঞানপিপাসু নারীদের ডিজিটাল জগতে পদচারণা বাড়াতেই এর আত্মপ্রকাশ। সেজন্য শারমিন আকতার বলেন, 'যেহেতু সময়টা ডিজিটাল, তাই যে কোনো সেক্টরে সফলতার সাথে কাজ করতে হলে ডিজিটাল ওয়েতেই এগোতে হবে'।[১৪] আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সেক্টরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমান ভূমিকা রাখছেন। আমাদের দেশে সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা, স্পিকার শিরীন শারমিন এর উদাহরণ।

অবশ্য আমাদের দেশে টিনএজার নারীরা অনলাইন জগতে এগিয়ে আছে ফেসবুকের মাধ্যমে। এই মাধ্যমে তারা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতার উন্নয়ন না ঘটিয়ে নানা রকম নোংরামি, অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। অনলাইনের অপব্যবহার না করে একে জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সৃজনশীল কাজে লাগাতে হবে। এতে বাংলাদেশের নারীদের বিষয়ে নানা খবর ও তথ্য নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে আর যারা অনলাইনে অনভ্যস্ত তাদের জন্য রয়েছে 'ত্রৈমাসিক মহীয়সী ম্যাগাজিন'র ব্যবস্থা।

নূরজাহান বেগম মানবসেবায় ব্রতী হয়েই 'বেগম' পত্রিকা ও নানাবিধ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে গেছেন। তিনিও 'বেগম' পত্রিকা চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েছিলেন; কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যে অটল থেকেই ছয় দশকের বেশি সময় পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

'অনন্যা'র সম্পাদক তাসমিমা হোসেন মানুষের জন্য কাজ করতে নিজের ভালোলাগা থেকে 'অনন্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন– অনেক প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে। একাজে তার কোনো ইনভেস্টর ছিল না। রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার দেশ ছাড়তে হলেও 'অনন্যা' একটি দিনের জন্যও বন্ধ হয়নি।

ইন্টারনেটের বৃহৎ পরিসরে নারীর অংশগ্রহণে জায়গা করে দেয়ার সিদ্ধান্তে সমাজের অনৈতিক অবস্থার বা সহিংসতার শিকার নারীদের পাশে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা থেকেই সুপ্রীতি ধর 'উইমেন চ্যাপ্টার' বের করেছিলেন। তিনি ও তার দুই বন্ধু মিলে নিজেদের অর্থে এর কাজ শুরু করেন। একাজ করতে গিয়ে তিনি হুমকির শিকার হয়েছেন, বিজ্ঞাপন চাইতে গিয়ে হেনস্তা হয়েছেন; কিন্তু তার লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি বলেছেন– 'পরিবর্তন চাইলে নারীদেরই কণ্ঠ তুলতে হবে।' তাসমিমা হোসেন নারীদের বলেছেন– 'তোমাকে ভয় দেখালে তুমি ভয় পেওনা, তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়াও।' নূরজাহান বেগম নতুন নারী সাংবাদিকদের বলেছেন, 'তোমরা নতুনরা নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করো। তোমাদের যদি মেয়ে বলে অবহেলা করা হয়, তোমরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাও। তোমাদের জন্য পত্রিকায় জায়গা করে নাও।' শারমিন আকতার মহীয়সী ডটকমের হাত ধরে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নারীদের শুদ্ধতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

নারীরা আজ বিশ্বজুড়ে যেভাবে পুরুষের পাশাপাশি সমান ভূমিকা রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে আশা করা যায়, নারীবিষয়ক গণমাধ্যমের পরিসর আরো বিস্তৃত হবে। 'নির্ভীক এই নারী সাংবাদিকরাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সত্য সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে'[১৫] – নূরজাহান বেগমের এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রতিপন্ন হবে এবং সাংবাদিকতার ধারাবাহিকতায় 'একসময় নারীরাই সাংবাদিকতায় আধিপত্য বিস্তার করবে'– তাসমিমা হোসেনের এ উক্তি সফল হওয়ার সময় খুব দূরে নয়, সন্নিকটেই।

তথ্যসূত্র :

১. কন্যা সাহসিনী, ২৭ জুলাই, ২০১৭।
২. চ্যানেল আই অনলাইন ডটকম, ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬।
৩. নূরজাহান বেগম/ উইকিপিডিয়া।
৪. সমকাল ডটকম, ২৩ মে,২০১৬।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. রক্তবীজ ডটকম/ তাসমিমা।
৭. সমকাল ডট নেট, ২৪ জুলাই, ২০১৭।
৮. রক্তবীজ ডটকম/ তাসমিমা।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১লা নভেম্বর, ২০১৬।
১১. অর্থসূচক ডটকম, ২০ নভেম্বর, ২০১৬।
১২. m.dw.com/bn ২৪ এপ্রিল, ২০১৪।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. Ekusher Surjodoy, ২৩ অক্টোবর, ২০১৪।
১৫. যুগান্তর ডটকম, ২৬ নভেম্বর, ২০১৭।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

গণমাধ্যম সংবাদ

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান

২০১৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যাঁরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, তাঁরা উন্নতমানের এমন সিনেমা করবেন, যা আমাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবকিছু ধারণ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের মর্যাদা বাড়াবে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৪ জুলাই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ২৫টি ক্যাটাগরিতে ৩১ জন শিল্পী ও কলাকূশলীকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া চিত্রনায়িকা শাবানা এবং সংগীতশিল্পী ফেরদৌসী রহমানকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় চলচ্চিত্রের কলাকূশলীদের দুঃসময়ে সহায়তার জন্য বিদ্যমান ট্রাস্ট ফান্ডটিকে আরো উন্নত করার ঘোষণা দেন। তিনি এই ট্রাস্ট ফান্ডকে একটি স্থায়ী রূপ প্রদানের আশ্বাস দেন।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম রহমতউল্লাহ। তথ্যসচিব মরতুজা আহমদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

(সূত্র: ২৫শে জুলাই ২০১৭, প্রথম আলো)

গণমাধ্যমের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ

একাদশ সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন করতে হবে। একই সঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন প্রধান দুই দলের মধ্যে সমঝোতা।

গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট ইসি'র সংলাপে অংশ নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এই মত দেন। তবে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন, 'না' ভোট প্রবর্তনসহ কয়েকটি বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

একাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ইসি। সংলাপে অংশ নেন ২৬ জন সাংবাদিক।

সংলাপে অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা নির্বাচনের আগে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, ইসিকে দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন, আইনের যথাযথ কঠোর প্রয়োগ, ভোটের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সুপারিশ করেন তাঁরা।

এছাড়া প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা, নিরপেক্ষ কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া, প্রার্থী হতে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর তিন বছরের সময়সীমা না কমিয়ে বাড়ানো, প্রার্থীর হলফনামা উন্মুক্ত রাখা, হলফনামায় ভুল তথ্য দিলে ব্যবস্থা নেওয়া, অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা, অনলাইনে অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণ, গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসি'র সম্পৃক্ততা বাড়ানোসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেন গণমাধ্যমের এসব প্রতিনিধি।

সংলাপে অংশ নেওয়া একাধিক সাংবাদিক বলেন- তাঁদের দৃষ্টিতে ইসি'র মূল চ্যালেঞ্জ সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করাসহ নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করা। এজন্য ইসি'র যা যা করা প্রয়োজন, তা করতে হবে। ইসিকে এক পক্ষের ভয় জয় করতে হবে আর অন্য পক্ষের খবরদারি ঠেকাতে হবে।

সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা, নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার, বেগম কবিতা খানম ও শাহাদাত হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে অংশ নেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল , মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর সম্পাদক নঈম নিজাম, ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর সম্পাদক নুরুল কবির, সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ, প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন।

আলোচনায় অন্যদের মধ্যে সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান, যুগান্তর-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম, কালের কণ্ঠ-এর নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল, ইত্তেফাক-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আশিস সৈকত, সাংবাদিক আনিস আলমগীর, বিএফইউজে'র দুই অংশের মহাসচিব ওমর ফারুক ও এম আবদুল্লাহ প্রমুখ অংশ নেন।

(সূত্র: ১৭ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো)

শিশুদের জন্য টিভি চ্যানেল 'দুরন্ত'

শিশুদের মনোজগতে ক্রিয়াশীল তথ্য, সংবাদ ও কাহিনী প্রচার এবং বিনোদনের জন্য যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশের প্রথম শিশু ও পরিবারভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'দুরন্ত'। গত ৫ই অক্টোবর রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে রেনেসাঁ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বারিন্দ মিডিয়া লিমিটেডের সংবাদ সম্মেলনে চ্যানেলটির লোগো উন্মোচন করা হয়। ওইদিন থেকেই এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়েছে।

'দুরন্ত' টিভির লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগর, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহবুব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দুরন্ত টিভি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাঈদ।

(সূত্র: ৬ অক্টোবরর ২০১৭, সমকাল)

সাউথ এশিয়ান ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেল ডেইলি স্টার

সাউথ এশিয়ান ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৭-এর আসরে ডেইলি স্টার সেরা ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন শাখায় গোল্ড এবং সেরা সোশ্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট শাখায় গোল্ড পুরস্কার জিতেছে।

ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপারস অ্যান্ড নিউজ পাবলিশার্স (ওয়ান-ইফরা) এবং গুগলের যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডেইলি স্টার-এর হেড অব মার্কেটিং তাজদিন হাসান এবং ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার শুভাশীষ রায় পত্রিকাটির পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে ডেইলি স্টার সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক ক্যাম্পেইনের জন্য সেরা সোস্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট শাখায় পুরস্কার লাভ করে।

এই ক্যাম্পেইন যৌথ আয়োজক হিসেবে ছিল সিবিএল মাঞ্চি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলাদেশে তৈরি পণ্যের রান্নাবিষয়ক উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা 'রাইজ হাই বাংলাদেশ'-এর জন্য সেরা ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন বিভাগে পুরস্কার লাভ করে পত্রিকাটি। (সূত্র: ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭, সমকাল)

রোকেয়া হায়দারকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের বিশেষ সম্মাননা

'বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় রোকেয়া হায়দার নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেও তিনি সাহস হারান-নি। আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে গেছেন। নিজের মেধা, যোগ্যতা ও পেশার প্রতি তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন বলেই আজ এই সাফল্য এসেছে।'

গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান সম্পাদক রোকেয়া হায়দারের সঙ্গে মতবিনিময় ও বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে রোকেয়া হায়দারকে জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট, ফুলের তোড়া, বই ও নানা উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন একাংশের মহাসচিব ওমর ফারুক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, উইমেনস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি বিলকিস আরা, মানবজমিনের প্রকাশক ও সংবাদ উপস্থাপিকা মাহবুবা চৌধুরী এবং বাসসের সাবেক বার্তা সম্পাদক রাশেদা বেগম। *(সূত্র: ১ অক্টোবর ২০১৭, কালের কণ্ঠ)*

ভয়েস অব আমেরিকার ৭৫ বছর

ভয়েস অব আমেরিকাকে (ভিওএ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন বলে বর্ণনা করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ২৬ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডিতে মাইডাস সেন্টারের ইএমকে মিলনায়তনে ভয়েস অব আমেরিকা'র ৭৫ বছর ও এর বাংলা বিভাগের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'মেনি ইয়ারস, মেনি স্টোরিজ-ভিওএ-৭৫ ও ভিওএ-৬০' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করে সঠিক তথ্যপ্রবাহ বজায় রেখে এদেশের জনগণের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ভয়েস অব আমেরিকা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ সবসময়েই মার্কিন সরকারের যে নীতিই থাক, ভয়েস অব আমেরিকা এদেশের মানুষের কথা তুলে ধরেছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ৩০ সেপ্টেম্বর ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান সম্পাদক রোকেয়া হায়দারকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিরা

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দারের সভাপতিত্বে ও নাসরিন হুদার সঞ্চালনায় সংস্থার সংবাদকর্মীসহ গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। *(সূত্র: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)*

চ্যানেল আই-এর বর্ষপূর্তি

১৯৯৯ সালের ১লা অক্টোবর। সিদ্ধেশ্বরীর মাত্র ৫০০ বর্গফুটের একটি ভাড়া বাড়িতে কয়েকটি কক্ষ ও জনাবিশেক কর্মী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে দেশের প্রথম ডিজিটাল বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল আই। গত ১ অক্টোবরে প্রতিষ্ঠানটি পদার্পণ করেছে ১৯ বছরে। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে নিজস্ব ভবনে হাজারো শুভানুধ্যায়ী সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে চ্যানেল আই। 'উনিশের উচ্ছ্বাস' প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণিল আয়োজনে ১৮তম বর্ষপূর্তি ও ১৯তম জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবে মাতে চ্যানেল আই পরিবার।

(সূত্র: ১ অক্টোবর ২০১৭, সমকাল)

ক্রীড়া সাংবাদিকদের পুরস্কার

জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ম্যাক্স-বিএসপিএ নাইট। গত ৯ সেপ্টেম্বর ফার'স হোটেলে এবার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ক্রীড়া সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করা হয়। সাক্ষাৎকার ক্যাটাগরিতে প্রথম রানারআপ হয়েছেন সমকালের ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়া সম্পাদক সঞ্জয় সাহা পিয়াল। গত বছরের অক্টোবরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের নায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সাক্ষাৎকারটি খুলনায় গিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, যা ২ নভেম্বর সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ক্যাটাগরিতে আতাউল হক মল্লিক ট্রফি জিতেছেন কালের কণ্ঠের নোমান মোহাম্মদ। সেরা সিরিজ রিপোর্টের জন্য আবদুল হামিদ ট্রফি পেয়েছেন প্রথম আলো'র মাসুদ আলম। এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট তৈরি করে প্রথম হয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের রিয়াসাদ আজিম। সেরা ফিচার/ডকুমেন্টারি ক্যাটাগরিতে রণজিৎ বিশ্বাস ট্রফি পেয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ইভান আকরাম। চার ক্যাটাগরির পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বর্ষসেরা ক্রীড়া সাংবাদিকের পুরস্কার তওফিজ আজিজ খান ট্রফি পেয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের রিয়াসাদ আজিম। পুরস্কারপ্রাপ্তদের ট্রফির সঙ্গে অর্থ পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

(সূত্র: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সমকাল)

শেরেবাংলা পদক পেলেন তিন সম্পাদক

সাংবাদিকতা পেশায় অনন্য অবদানের জন্য শেরেবাংলা পদক পেয়েছেন তিন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁরা হলেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম এবং বাংলাদেশ নিউজ ও বাংলাদেশের খবর-এর সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া। ২১ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে বরিশাল বিভাগ সমিতির উদ্যোগেও পদক

বরিশাল বিভাগ সমিতির উদ্যোগে শেরেবাংলা পদক পেলেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম এবং বাংলাদেশ নিউজ ও বাংলাদেশের খবর-এর সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক দুটি শ্রেণিতে তিনজন সাংবাদিককে এই পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সাংবাদিকতা পেশায় অনন্য অবদানের জন্য পিআইবি'র চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার ও যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার জন্য প্রকাশিতব্য বাংলাদেশের খবরের সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়াকে এই পদক দেওয়া হয়।

পদক প্রদান করেন বরিশাল বিভাগ সমিতির সভাপতি ইতিহাসবিদ সিরাজ উদ্দীন আহমেদ। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এমএ জলিল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ স ম মোস্তফা কামাল, আইন বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমানসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

পদক গ্রহণকালে সমকাল সম্পাদক বলেন, শেরেবাংলা এমন একজন নেতা ছিলেন যাঁর কাছ থেকে বাঙালি জাতির শিক্ষণীয় আছে। তাঁর আদর্শ ধারণ করেই পরবর্তী সময়ে লাহোর প্রস্তাব অনুসরণ করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সাবেক সচিব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ বলেন, শেরেবাংলার মাজারে একটি শেরেবাংলা একাডেমি করে তাঁর ওপর গবেষণা করে তাঁর আদর্শ-উদ্দেশ্য, সেবা সবকিছুই তুলে ধরতে হবে জাতির কাছে।

(সূত্র: ২৩ জুলাই ২০১৭, ইত্তেফাক)

১৫ বছরে এনটিভি

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ১৫ বছরে পদার্পণ করেছে। 'সময়ের সাথে আগামীর পথে' স্লোগান নিয়ে ২০০৩ সালের ৩রা জুলাই যাত্রা শুরু করে এনটিভি। ঠিক পরের বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ২৪ ঘণ্টার সম্প্রচার শুরু করে চ্যানেলটি। দেশি চ্যানেলগুলোর মধ্যে এনটিভিই সর্বপ্রথম ২০১১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অর্জন করে আইএসও সনদ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চ্যানেলটি।

(সূত্র: ৩ জুলাই ২০১৭, প্রথম আলো)

ভারতে জ্যেষ্ঠ নারী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে গুলি করে হত্যা

ভারতের সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে (৫৫) গত ৫ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালুরে তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গৌরী লঙ্কেশ হিন্দু দক্ষিণপন্থীদের কঠোর সমালোচক ছিলেন।

ব্যাঙ্গালুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার জানিয়েছেন, গত ৫ সেপ্টেম্বর রাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, তখন বাড়ির ঠিক সামনেই তাঁর ওপর গুলি চালানো হয়।

এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'গৌরী যখন বাড়ির দরজা খুলছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বুকে দু'টি আর মাথায় একটা গুলি করা হয়।' তবে গৌরী লঙ্কেশের ঘনিষ্ঠরা বলছেন, দক্ষিণপন্থী মতবাদ নিয়ে চলা বেশ কয়েকটি সংগঠনের কাছ থেকে নিয়মিত হুমকি পাচ্ছিলেন তিনি। ৪০ বছর আগে বাবার প্রতিষ্ঠিত 'লঙ্কেশ পত্রিকা' সম্পাদক ছিলেন গৌরী লঙ্কেশ।

(সূত্র: ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, কালের কণ্ঠ)

সাংবাদিক গৌরী হত্যায় ভারতজুড়ে বিক্ষোভ

ব্যাঙ্গালুরুতে সন্ত্রাসীর গুলিতে নারী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ নিহতের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বইছে ভারতজুড়ে। অনেকে বলছেন, কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে কেউ সরব হলেই তার জীবন আর নিরাপদ থাকছে না।

গত ৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই ব্যাঙ্গালুরের রাজপথে নেমে বিক্ষোভ করে সাংবাদিক সংগঠনগুলো। এছাড়া দিল্লিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব, কলকাতায় নারী সাংবাদিকদের সংগঠন উইমেনস প্রেস কোরসহ বিভিন্ন শহরের প্রেস ক্লাব বিক্ষোভ মিছিল করেছে। সাংবাদিকরা ছাড়াও আরএসএস ও বিজেপি'র অনেক নেতা-মন্ত্রী গৌরী হত্যার নিন্দা জানিয়েছেন। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, গৌরীকে খুন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। *(সূত্র: ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

ভারতে সাংবাদিক হত্যা

পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় জেলার মোহালি এলাকায় নিজের বাড়িতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কে জে সিংকে (৬৪) গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তার মা গুরুচরণ কৌরকে (৯২) শ্বাসরোধে হত্যা করে তারা।

দুর্বৃত্তরা সিংয়ের বাসায় প্রবেশ করে। পুলিশ গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সিং ও তাঁর মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

কে জে সিং ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত টাইমস অব ইন্ডিয়ায় কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দ্য ট্রিবিউনে কাজ করেন। *(সূত্র: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

ভারতে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিককে হত্যা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায় প্রতিবাদ র‍্যালির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে খুন হন শান্তনু ভৌমিক নামের ওই সাংবাদিক। তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় একটি টেলিভিশনে কর্মরত ছিলেন। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাইয়ে ওই সাংবাদিক খুন হন।

স্থানীয় পুলিশপ্রধান এ কে শুক্লা বলেন, সংবাদভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'দিনরাত'-এর রিপোর্টার ছিলেন শান্তনু। ২০ সেপ্টেম্বর তিনি আইপিএফটি ও ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ (টিআরইউজিপি) আয়োজিত বিক্ষোভ-সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে যান। আদিবাসীরা ওই সময়ে সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সেখান থেকে শান্তনুকে অপহরণ করা হয়। শুক্লা জানান, অপহরণের কিছুক্ষণ পর শান্তনুকে উদ্ধার করা হয়। তবে তৎক্ষণে তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর শরীরে বহু ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যান শান্তনু। *(সূত্র: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

সুইডিশ সাংবাদিক হত্যা

নিখোঁজ হওয়ার প্রায় দুই মাস পর সুইডিশ সাংবাদিক কিম ওয়ালের বিচ্ছিন্ন মাথা ও পা কোগে উপসাগর থেকে উদ্ধার করেছে ডুবুরিরা। গত ৭ অক্টোবর ডেনমার্কের পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে

এই তথ্য জানানো হয়। কোপেনহেগেন পুলিশের কর্মকর্তা জেনস মুলার জেনসেন বলেন, কোগে সাগরে সন্ধান চালানোর সময় ডুবুরিরা কাপড়ভর্তি একটি ব্যাগের সন্ধান পায়। পরে সেটির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় মস্তক ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পায়ের অংশ। তিনি বলেন, 'গতরাতে ফরেনসিক দন্ত চিকিৎসকরা পরীক্ষা শেষে নিশ্চিত হয়েছেন, উদ্ধার হওয়া মস্তকটি ৩০ বছর বয়সি সুইডিশ সাংবাদিক ওয়ালের।'

ডেনমার্কের পিটার মেডসেন নামের এক সাবমেরিন নির্মাতাকে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য গত ১০ আগস্ট ওয়াল তাঁর সঙ্গে সাবমেরিনে ওঠেন। এরপর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বর্তমানে ডেনিশ আদালতে হত্যা মামলায় বিচারের সম্মুখীন মেডসেন। *(সূত্র: ৮ অক্টোবর ২০১৭, কালের কণ্ঠ)*

শোক সংবাদ

নায়ক রাজ রাজ্জাক

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ ও কিংবদন্তি অভিনেতা নায়করাজ রাজ্জাক আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ আগস্ট রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

হাসপাতালটির চিফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সাগুফা আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নায়ক রাজ্জাক পাঁচ সন্তানসহ বন্ধু-বান্ধব ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রাজ্জাক ১৯৪২ সালে ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার টালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। সত্তরের দশকে তাঁকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে প্রধান অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি একাধারে অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

আখেরি স্টেশন, বেহুলা, আগুন নিয়ে খেলা, এতটুকু আশা, নীল আকাশের নীচে, জীবন থেকে নেয়া, নাচের পুতুল, অশ্রু দিয়ে লেখা, ওরা ১১ জন, অবুঝ মন, রংবাজ, আলোর মিছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র।

নায়করাজ রাজ্জাক পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। এছাড়া ইন্দো-বাংলা কলা মিউজিক পুরস্কার, বাচসাস পুরস্কার, আজীবন সম্মাননা (চলচ্চিত্র), ইফাদ ফিল্ম ক্লাব পুরস্কার পান তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী

ভাটি অঞ্চল চষে বেড়ানো অনন্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ১লা সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিকে নিজ বাসভবনে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার গইচ্চা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৩৬ সালে সালেহ চৌধুরীর জন্ম। শিক্ষাজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে সিলেটের এম সি কলেজে। ঢাকাতে এসে সাংবাদিক হিসেবে যোগদেন দৈনিক বাংলা'য়। তিনি এই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য সালেহ চৌধুরী কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি ছিলেন।

সালেহ চৌধুরী ১৯৭১ সালে টেকেরঘাট সাব-সেক্টরের অধীনে দিরাই, শাল্লা, জগন্নাথপুরসহ ভাটি অঞ্চলে বেশকিছু যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

সঞ্জীব চৌধুরী

সাংবাদিক সঞ্জীব চৌধুরী পরলোকগমন করেছেন। গত ৩১ আগস্ট রাতে রাজধানীর গেণ্ডারিয়ার আজগর হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তিনি মারা যান।

কর্মজীবনে তিনি দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক নিউ নেশনের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

কাজী সিরাজ

বিশিষ্ট সাংবাদিক কাজী সিরাজ আর নেই। গত ৩১ আগস্ট রাজধানীর বনশ্রীর নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট কাজী সিরাজ টানা চার যুগ সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি সাপ্তাহিক 'রোববার'-এর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দেশের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখতেন তিনি। রাজনৈতিক সংবাদ বিশ্লেষণ ও টিভি টকশো'তে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি।

আনোয়ার আহমেদ

খুলনার দৈনিক জন্মভূমির বার্তা সম্পাদক এবং খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক আনোয়ার আহমেদ (৬২) গত ১১ জুলাই ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

আনোয়ার আহমেদ ১৯৭৭ সালে খুলনার অধুনালুপ্ত প্রথম দৈনিক জনবার্তায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে দৈনিক গণদেশ, দৈনিক কালান্তর, দৈনিক অনির্বাণসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি অবিভক্ত খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

সর্বশেষ তিনি খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক জন্মভূমির বার্তা সম্পাদক ও মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

বুলবুল চৌধুরীর

রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বুলবুল চৌধুরী (৫৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি হৃদরোগসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দৈনিক যুগান্তরের রাজশাহী ব্যুরোপ্রধানসহ দৈনিক বাংলা, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন।

শামসুল আনোয়ার

প্রবীণ সাংবাদিক শামসুল আনোয়ার মানিক ৩০ সেপ্টেম্বর মিরপুরের ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি সর্বশেষ দৈনিক দেশবাংলার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন।

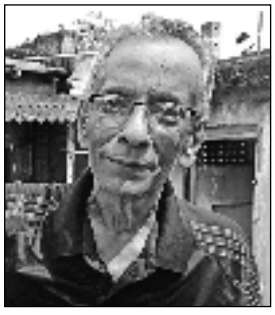

অমিত বসু

বর্ষীয়ান সাংবাদিক অমিত বসু আর নেই। গত ৩রা জুলাই কলকাতার ১১/৭, বি রামকৃষ্ণ দাস লেনের পৈতৃক বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

অমিত বসু দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার কলকাতা প্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। একই সঙ্গে কলকাতার তারা নিউজের বাংলাদেশ বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন বহুদিন। পেশার কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশ ঘুরেছেন বর্ষীয়ান এই সাংবাদিক।

কয়েক বছরে ধরে অমিত বসু আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে নিয়মিত বাংলাদেশ বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতেন। ঢাকা'র আরো একটি নামি পত্রিকা দৈনিক কালের কণ্ঠে 'এপার-ওপার' শিরোনামে তাঁর সাপ্তাহিক কলামটি দুই বাংলার বোদ্ধা পাঠকমহলে ছিল জনপ্রিয়।

বেশকিছু উপন্যাসও লিখেছেন অমিত বসু। 'মরমিয়া', 'বিহান', 'উজান' তার মধ্যে অন্যতম।

সোহানুর রহমান সোহান

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির স্টাফ রিপোর্টার সোহানুর রহমান সোহান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২১ সেপ্টেম্বর ধানমণ্ডির শঙ্করের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর।

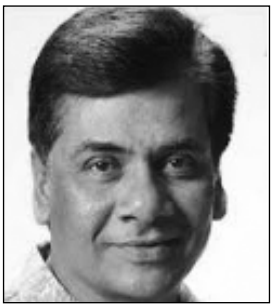

আবদুর রাতিন

মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের গুণী অভিনেতা আবদুর রাতিন মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

১৯৭২ সাল থেকে টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করছেন। এ পর্যন্ত দুই শতাধিক টেলিভিশন নাটকে তাঁকে দেখা গেছে। রাতিন অভিনীত উল্লেখযোগ্য টেলিভিশন নাটক হলো: রত্নদ্বীপ, মহুয়ার মন, অভিনেতা, বোবাকাহিনী, গৃহবাসী প্রভৃতি। ১৯৭০ সালে 'নতুন প্রভাত' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক ঘটে। রাতিন অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমা হলো হারানো সুর, দেবদাস, শুকতারা, জবাব চাই, স্নেহের প্রতিদান, লালু সর্দার প্রভৃতি।

এমএ মান্নান

চিলমারী প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক, অধ্যক্ষ এমএ মান্নান (৬৫) গত ১৪ অক্টোবর নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দৈনিক বাংলাবাজার, দৈনিক অর্থনীতি ও দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর পত্রিকায় বিভিন্ন সময় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

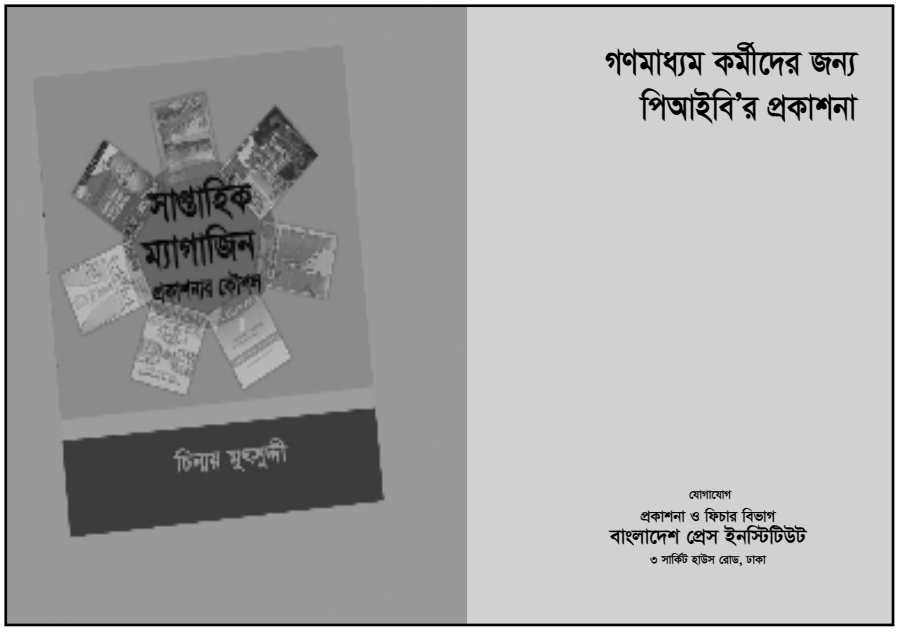

'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্মের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হচ্ছে, সেই অগ্রগতির ধারাকে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও বজায় রাখতে অনলাইনে সাংবাদিকতা শেখার জন্য পিআইবি চালু করেছে সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীসহ যে কোনো নাগরিক অনলাইনে সাংবাদিকতার ৪টি কোর্সের মাধ্যমে এখন নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। দেশের সাংবাদিকতা প্রশিক্ষকগণের ক্ষেত্রে এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

২৯ আগস্ট পিআইবি অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্মের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এসব কথা বলেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি আরো বলেন, অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষার এ সুযোগ দেশের সাংবাদিকতা শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদকর্মীরা নিজেদেরকে আরো যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারবেন।

পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের (এটুআই) জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাঈমুজ্জামান মুক্তা।

উল্লেখ্য, পিআইবি এবং এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে সংবাদকর্মী, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকতায় আগ্রহী তরুণদের জন্য 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক চার মাস মেয়াদি চারটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে।

সাংবাদিকতায় বেসিক কোর্স, টেলিভিশন সাংবাদিকতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা শীর্ষক এই চারটি কোর্সে সাংবাদিকসহ আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

পিরোজপুরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর উদ্যোগে পিরোজপুরে সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ সেপ্টেম্বর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পিরোজপুর এলজিইডি মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সেখ। প্রেস ক্লাব সভাপতি শফিউল হক মিঠুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে, পিরোজপুর এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রফিকুল হাসান, জেলা তথ্য অফিসার মো. সিরাজুল ইসলাম মল্লিক। পিরোজপুরে কর্মরত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৪০ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

কমিউনিটি রেডিওর সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

কমিউনিটি রেডিওর সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ সেপ্টেম্বর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। সারাদেশের ১৪টি কমিউনিটি রেডিও'র ২৮ জন সাংবাদিক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০১৭ জিতে নিলেন সাত সাংবাদিক

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর যৌথ আয়োজনে গত ২৭ আগস্ট পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে প্রচারণার জন্য সাত সাংবাদিককে পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০১৭ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার। সভাপতিত্ব করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, অতীতের মতো বর্তমানেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। রাষ্ট্র আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি গণমাধ্যম কর্মীদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, গণমাধ্যমের কর্মীরা অতীতে জঙ্গিবাদ ও তাণ্ডবের বিরুদ্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আগামীতেও ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবেন। মন্ত্রী আরো বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার জনগণের জন্য যেসব প্রাযুক্তিক সেবা ও সুবিধা প্রদান করছে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সাংবাদিকদের আরো বেশি এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সহজ হবে।

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০১৭ বিজয়ীদের সাথে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য এটুআই যেসব কাজ ও সেবা সরবরাহ করে যাচ্ছে, সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সংবাদকর্মীরা।

উল্লেখ্য, এ বছর ৬টি ক্যাটাগরিতে সাত জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ক্যাটাগরিতে দৈনিক জনকণ্ঠের এম শাহজাহান, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে ৭১ টেলিভিশনের মোহাম্মদ মাফিজুল ইসলাম, অনলাইন সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে আরটিভি অনলাইনের মাইদুর রহমান রুবেল, ফটো-সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে প্রথম আলো'র সৈয়দ আশরাফুল আলম, আঞ্চলিক সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে দৈনিক গ্রামের কাগজের এস এম আরিফুজ্জমান, রেডিও ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে রেডিও চিলমারী'র মো. কামরুল হাসান পলাশ ও রেডিও পদ্মা'র মো. সাদী মাহমুদ। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান, এটুআই প্রোগ্রামের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাঈমুজ্জামান মুক্তা, সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ।

টাঙ্গাইলে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে সাংবাদিকতায় তিন দিনব্যাপী (৯-১১ জুলাই) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন পিআইবি'র পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাটাইল প্রেস ক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ঘাটাইল, ভূঞাপুর, মধুপুর, গোপালপুর ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিভিন্ন পত্রিকার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি আয়োজিত পিরোজপুরের সাংবাদিকদের জন্য দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাসসের জেলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ

পিআইবি'তে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর জেলা প্রতিনিধিদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ

পিআইবি'তে বাসস'র জেলা প্রতিনিধিদের তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

পিরোজপুরে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-র আয়োজনে ১৫ সেপ্টেম্বর পিরোজপুরের সাংবাদিকদের জন্য দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিরোজপুর এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগম। কর্মশালায় পিরোজপুরে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।